এই সীমান্তে

নবেন্দুভূষণ ঘোষ

বেঙ্গল পাবলিশার্স
বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল পাব্লিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট এবং শ্রীপতি প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস, ১৪নং ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

আড়াই টাকা

লেখকের অন্যান্য বই

ডাক দিয়ে যাই (২য় সং), নায়ক ও লেখক, মানুষ

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও।

কাগজ সরবরাহ করে সহায়তা করেছেন বেঙ্গল পেপার মিলসের শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার সিংহ।

মাঝি

হঠাৎ নৌকাটি একটি ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া এক ঘুরপাক খাইতেই ভৈরব তাড়াতাড়ি হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল "হুঁস্ নাই ত'র ছাগল কোথাকার,—ছোট নৌকার হালটাও ঠিক ভাবে ধইরা রাখ্‌তে পারস্ না—"

বলিতে বলিতে সে প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানিতে লাগিল নৌকাটি ঘুরপাক খাইতেই রাখাল একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয় পড়িয়াছিল। সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল তাহার বিবাহের কথা, কারণ কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহার পিতা তারাপদ নবাবপুরে একটি মেয়েকে দেখিতে গিয়াছিল। মানসনেত্রে সে মেয়েটিকে একটি লক্ষ্মীপ্রতিমার মত দেখিতে পাইতেছিল। ভৈরবের হুঙ্কারে সে বলিষ্ঠ মুষ্টি দ্বারা হালটাকে একটু ঘুরাইয়া দৃঢ়ভাবে নৌকাকে উত্তর মুখে পরিচালিত করিতে করিতে লজ্জিতভাবে বলিল—"একটু কথা ভাব্‌ত্যাছিলাম, তাই—"

ভৈরব তখন প্রাণপণে দাঁড় টানিতেছে। বর্ষার পদ্মা দানবীর মত শক্তিশালিনী, ঘূর্ণিপাকের বাহিরে আসিবার জন্য তাহার প্রত্যেকটি পেশী তখন দাঁড় চালনায় নিযুক্ত। মোটা মোটা শিরগুলি সর্ব্বদেহে ফুলিয়া উঠিয়াছে, নিঃশ্বাসও পড়িতেছে দ্রুততর, উন্নত বুকটা আরও উন্নত আরও বিশাল হইয়া উঠিয়াছে। রাখালের কথার কোনও উত্তর সে তৎক্ষণাৎ দিল না। মিনিট তিনেক পরে নৌকা যখন অবশেষে ঘূর্ণিপাকের বাহিরে আসিয়া স্রোতভরে উড়ন্ত পালের সাহায্যে তরতর করিয়া ভাসিয়া চলিল, তখন সে দাঁড়টা ছাড়িয়া

গায়ে আটকাইয়া রাখিয়া, গামছা দিয়া ললাটের ঘাম মুছিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "ভাব্‌ত্যাছিলা? আহা, খাজা খাঁর পোলার কথা শুইনা মইরা যাইবে—"বলি কি ভাব্‌ত্যাছিলা?"—

রাখাল প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হাসিল।

ভৈরব হাত নাড়িয়া প্রশ্ন করিল, "কি কত্তা, বলি ভাব্‌ত্যাছিলা কি—এঁ্যা?"—তারপরে সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"ছোট্ট এউক্কা রাঙা মুখের কথা—না?"

রাখাল লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, "ধ্যেৎ, কি যে হাবিজাবি কথা কও ভৈরবদা—ধ্যেৎ—"

ভৈরব মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—"বেবাক বুঝিরে দাদা, বেবাক বুঝি। আরে, তা অমন অইয়াই থাকে, আমি কি আর বিয়া করি নাই?"

রাখাল লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল নির্ব্বোধের মত।

ভৈরব এবার হাঃহাঃ করিয়া খানিকটা হাসিল, পরে রাখালের নির্ব্বাক হাসি ব্যতীত আর কোন সহযোগিতা না পাইয়া সে অগত্যা হুঁকাটা আবার টানিয়া লইল। তামাক টানিতে টানিতে সন্থ ওরফে সৌদামিনীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। বিবাহের কথায় তাহার নিজের জীবনের সেই একটি স্মরণীয় দিবসের কথা চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সন্থ তখন ছিল মাত্র এগার বৎসরের। একটি দিনের জন্ত সে কিন্তু রাজার মত সমাদর লাভ করিয়াছিল। লাল চেলি পরিয়া, চন্দনের ফোঁটা কপালে, টোপর পরিয়া যখন সে বিবাহমণ্ডপে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহাকে ভৈরব মাঝি বলিয়া কেহ চিনিতে পারে নাই। সেই দিন রাত্রে কতকগুলি মেয়ে কিন্তু তাহাকে চিমটি কাটিয়া, কাণ

মলিন্না দিয়া বড় জালাতন করিয়াছিল। আর তাহার ক্রোধ ও মেয়েগুলির হাসি দেখিয়া সদু মাথার ঘোমটা ফেলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। সম্পর্কীয়া এক বুড়ী ঠানদি ছুটিয়া আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিয়াছিল, "ওমা, পোড়ার মুখী জামাইয়ের সামনেই কেমন হাসত্যাছে—ওমা !"

ভৈরব তামাক খাইতে খাইতে নিজের মনে নিঃশব্দে হাসিল। সেই বুড়ীটি বড় রসিকা ছিল। সদুকে লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় বুড়ী তাহার গলা জড়াইয়া কান্নার সুর করিয়া বলিয়াছিল, "আমারে ফেইলা, আমার সব্বনাশ কইরা যাইত্যাছ ক্যান গো, আমি ক্যামনে বাচুম্, আমি যে তুমার ছিচরণের দাসী"—ভৈরব আবার নিজের মনে হাসিল হ্যাঁ, সেই বুড়ী ভারী রসিকা ছিল। কিন্তু সে আজ প্রায় তের বৎসর আগেকার কথা।

ভৈরব হুঁকাটা রাখালের হাতে দিয়া বলিল, "আইজ আর বোধ হয় বিষ্টি অইব না।"

রাখাল মাথা নাড়িল, "তা কিছুই কওন যায় না, রোজ যে রকম বিষ্টির নমুনা দেখ্ত্যাছি।"

ভৈরব আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "না, আইজ আর তেমন কই ?"

হুঁকায় এক টান দিয়া রাখাল বলিল, "তবু, বিশ্বাস নাই।"

ভৈরব সায় দিল, "হ—তা ঠিক কইচস্।"

একটু পরে সে আবার বলিল, "এই বারকার মতন এত বিষ্টি আমার জন্মে আর দেখি নাই রে, আমার মনে হয় এইবার জলে সব ডুবাইব।"

"তা অইবার পারে।"

পালভরে ছোট নৌকাটি গর্জমান তরঙ্গের বক্ষ ভেদ করিয়া

ভাসিয়া চলিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, সূর্য্য পশ্চিম দিকের জলে লাল হইয়া ডুবিতেছিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কালো মেঘের পার্শ্বদেশে, সেই ডুবন্ত লাল সূর্য্যের রঙীন স্পর্শ। দিগন্ত বিস্তৃত অসীম জল-প্রবাহের মধ্যে অসংখ্য আবর্ত্ত, অজস্র ফেণার রাশি। মাঝে মাঝে উন্মত্ত জল-কল্লোলের শব্দের সহিত বড় বড় মাটির চাপ ভাঙ্গার শব্দ ভাসিয়া আসে।

একটি মহাজনী নৌকা কাছাকাছি আসিতে ভৈরব হাঁক দিল, "কোন গাঁওথানে আইত্যাছ মাঝি ভাই ?"

আব্ছা অন্ধকারে ছায়া মূর্ত্তির মত একজন মাঝি মহাজনী নৌকাটি হইতে উত্তর দিল, "ঈশানপুর—তোমরা মেলা দিছ কই ?"

গলা-ছাড়িয়া ভৈরবও প্রশ্নের উত্তর দিল—"তেতুল ঝোরা—"

মহাজনী নৌকাটা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। অন্ধকারও ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। রাখাল বাত্তিটা জ্বালাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। জলের শব্দ শুনিতে শুনিতে সে আবার একটি মেয়ের মুখ কল্পনায় আঁকিতে আরম্ভ করিল। খানিক পরেই ডান দিকের খাল ধরিয়া নৌকা চলিল। হাট, ইস্কুল ঘর, কাছারী, দত্ত-বাড়ী, সব ছাড়াইয়া অবশেষে নৌকা মাঝি-পাড়ায় থামিল। অন্তকার জীবন সংগ্রাম শেষ হইল। এখন বিশ্রাম। আঃ।

একটি বাব্লা গাছের সঙ্গে নৌকার শিকল ও তালা লাগাইয়া স্থাওড়ার ঝোপ, বাঁশবন, হিজল ও বেতবনের মধ্যবর্ত্তী গ্রাম্য পথ দিয়া ভাঁট ফুলের আঘ্রাণ লইতে লইতে ভৈরব ও রাখাল বাড়ী দিকে চলিল। প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া লণ্ঠন ও দাঁড়। রাখা সোজা পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাড়ী আরও একটু দূরে, ভৈরবের বাড়ী কিন্তু খাল হইতে মাত্র তিন চার মিনিটের রাস্তা। রাখাল ভৈরবের সঙ্গেই নৌকা চালায়, তাহার বাপ ও অন্তান্ত তিন

ভাইয়েরা একটি গয়নার নৌকা চালায়। ভৈরবের সহিত রাখালের দশ আনা ছয় আনা সম্বন্ধ। উভয়ে মিলিয়া তাহারা মন্দ রোজগার করে না। পেট ভরিয়া খাবার তাহাদের জুটিয়া যায় বসনেরও অভাব হয় নাই কেবল গরমের দিনে রোজগার একটু মন্দা হইয়া পড়ে। তা আর কি করা যাইবে, অবস্থা যে রোজই এক থাকে না, মাঝিরা সে কথা বিশ্বাস করে।

লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখিতে দেখিতে ভৈরব চলিল। নিবারণ মাঝির বাড়ীর দাওয়ায় শ্রীনাথ বসিয়া ছিল, সে ডাকিয়া বলিল, "কেডা, ভৈরব না কি ?"

"হুঁ।"

"কোন গাঁয়ে গেছিলি আইজ কা ?"

"পলাশপুর"—

শ্রীনাথ চুপ করিল, ভৈরব এবার প্রশ্ন করিল,—"তুই আইজ যাস্ নাই ক্যান ?"

"পোলাটার বড় ব্যারাম অইচে—"

"কবেথনে ?"

"কাউলকা রাত্রিরথনে বমি আর জ্বর অইতেছে"—

ভৈরব চলিতে চলিতে একবার হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার এমন সুখের সংসার অথচ তাহার একটিও সন্তান হইল না। একটি যদি পুত্র হইত, তবে আজ তাহার কত বয়স হইত ? কবে হইলে ? আন্দাজ ? মনে মনে হিসাব করিতে করিতে সে বাড়ী পৌছাইল।

সদু দরজা বন্ধ করিয়া রান্না করিতেছিল, কড়া নাড়ার শব্দে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, হাতে একটি কেরোসিন তৈলের ডিবা, তাহার ম্লান ও কম্পিত আলোকে, কালো পাথরে খোদাই করা নিখুঁত প্রস্তর মূর্তির মত কদুর সুগঠিত দেহ দেখিতে দেখিতে ভৈরবের শরীরের

রক্ত কেমন যেন নাচিয়া উঠে। তের বৎসর যাবৎ তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, এই তের বৎসর যাবৎ সে সদুকে দেখিয়া আসিতেছে তাহার দেহে যৌবনের নিত্য নূতন ভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র একটি কিশোরীকে যুবতীতে পরিণত হইতে সে লক্ষ্য করিয়াছে এবং মুগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু আজ হঠাৎ আবছা আলোতে দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান সদুর মধ্যে সে যৌবনের সমস্ত রূপ এক সঙ্গে দেখিতে পাইয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অদ্ভুত, রহস্যময় বোধ হইতে লাগিল। ভৈরব বর্ষার নদীর উন্মত্ততাকে ভয় করেনা, ঝড়ের রাত্রির উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গরাশিকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সদুর ঐ পাৎলা ওষ্ঠদ্বয়, সমুন্নত বক্ষদেশ, বলিষ্ঠ অঙ্গের অশ্রুত ছন্দ, হঠাৎ হাসি আর চক্ষু ঘুরান দেখিলে সত্যই ভয় পায়। ভয় পায় সদু হঠাৎ রহস্যময়ী হইয়া উঠে বলিয়া। আজও সে দেখিল, কিন্তু আজ যেন সদু আরও রহস্যময়ী।

সদু হাসিয়া কথা বলিল, "ওমা, আইজ যে বড় সকাল সকাল?"

ভৈরবের চমক ভাঙ্গিল, দরজাটা বন্ধ করিতে করিতে সে বলিল, 'আইজ—বেশীদূর যাইতে হয় নাই—তাই আইজ আর তর লাইগ্যা—"

সদু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সদু এখনও পর্য্যন্ত ছেলে-মানুষের মত। কোনও সন্তান না হওয়ায় তাহার মধ্যে গাম্ভীর্য্যময়ী নারীত্বের প্রকাশ হয় নাই।

হাসিতে হাসিতে সে প্রশ্ন করিল, "আমার লাইগ্যা?"

"হ।"

"আমি বিশ্বাস করলাম্ না।"

"না অইলে আর কি করুম ক'।"

"আমার গাও ছুঁইয়া কও।"

দাঁড়টা ও লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া খপ্ করিয়া সদুকে এক হাতে

টানিয়া লইয়া ভৈরব হাসিয়া বলিল, "তর গাও ছুইয়াই কই-ত্যাছি—"।

সহু হঠাৎ জিভ্ বাহির করিয়া ফেলিল, "ওমা, তোমার গায়ে কি ঘাম আর পায়েকি প্যাক—যাও যাও, পাও ধোও গিয়া।"—

ভৈরবের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া সহু রান্নাঘরে গেল।

ভৈরব জল লইয়া মুখ হাত ধুইতে বসিল। মুখ ধুইতে ধুইতে সে ডাকিল—"বৌ।"

রান্নাঘর হইতে সহু উত্তর দিল, "কি কও?"

"পিসী আইব কবে?"

"ক্যান?"

"তর এমন একলা একলা থাকনটা খারাপ, আমি যাই আমার কামে—"

"আমার ডর লাগে না।"

"তবুও একলা মাইয়া লোক মানুষ—"

"পিসী মাইয়ার বাড়ী গ্যাছে, আইবনে দিনদশেক পরে।"

দূর সম্পর্কের এক পিসী তাহাদের সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেও প্রায় দিন কুড়ি হইল তাহার একমাত্র মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে মেয়েকে দেখিতে গিয়াছে। বুড়ী চলিয়া যাইবার পর হইতেই ভৈরবের মনে সব সময়েই ভাবনা। নৌকা চালাইতে চালাইতে সে সহুর কথা ভাবে। একলা সহু বাড়ীতে রহিয়াছে, তাহার হয়ত কোনও বিপদ হইতে পারে, এমনি নানা কথা। যদিও সে পাশের বাড়ীর রজনীর মাকে সহুর উপর নজর রাখিতে বলিয়া যায়, তবুও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। মাঝে মাঝে সে ভাবে যে কোনও দুষ্টপ্রকৃতির লোক হয়ত সহুর একাকীত্বের সুযোগে তাহার কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে পারে।

যদিও এরূপ চিন্তা নিতান্ত বালকোচিত, তবু এই চিন্তা মাথায় আসিতেই তাহার চক্ষু মুখ কালো হইয়া উঠে, বিশাল ও লোমশ বক্ষটা ক্রোধে ঘন ঘন ফুলিয়া উঠে, অদৃশ্য ও কল্পিত শত্রুটির মনে মনে মুণ্ডপাত করিতে করিতে সে বারংবার দাঁত ঘষিতে থাকে।

খানিক পরে হুঁকাটা হাতে লইয়া ভৈরব বাহির হইল বিশুদের আড্ডায় গল্পগুজব করিতে। সদু ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরবা কখন?"

চলিতে চলিতে ভৈরব জবাব দিল—"ঘণ্টাখানিকের মধ্যে ফিরুম্।"

ভিতরে যাইতে যাইতে সদু বলিল, "তাড়াতাড়ি ফিরা আইসো কিন্তু একলা ভাল্ লাগে না—"

ভৈরবের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল—"ক্যান ক'তো বৌ?"

"জানি না"—বলিয়া সদু ভিতরে চলিয়া গেল।

ভৈরব হাসিয়া চলার বেগ বাড়াইয়া দিল।

দুইটি বাড়ীর পরেই বিশুর বাড়ী। সেখানে প্রায়ই আড্ডা জমে, আজও বসিয়াছে।

ভৈরব গিয়া হাঁক দিল, "কৈ রে, বিশু গেলি কৈ?"

"আয় রে"—বিশু ভিতর হইতে ডাকিল।

ভিতরে আড্ডা পুরাদমে জমিয়া উঠিয়াছে। তামাকের ধোঁয়ায় আর গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ভারী। কয়েকজন মিলিয়া এক কোণে বহু পুরাতন বিবি মার্কা তাস নিবিষ্ট চিত্তে খেলিতেছিল।

ভৈরব ঘরে প্রবেশ করিতেই বিশু বলিল, "আইজ্কার খবর জানস্ নি?"

ভৈরব বসিতে বসিতে মাথা নাড়িল।

বিশু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "জানস্না ইটা কি কস্! আরে, মুর্শিদী যে কাইল রাত্তিরে ডুইবা গ্যাছে—"

গতরাত্রিতে প্রবল ঝড় হইয়াছিল। বিশু তাহারই গল্প বলিতে লাগিল। অন্ধকারে পথ ভুলিয়া তারিণী একেবারে মাঝ গাঙে গিয়া পড়িয়াছিল। ঝড় আর তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে নৌকাসহ তারিণী ও আরও দুইজন যাত্রী ডুবিয়া মারা গিয়াছে। তারিণীর সহচর কালুই কেবল বাঁচিয়া সে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এ গল্প শুনিয়া ভৈরব কাতর হইল না। মাঝিদের জীবনে এরকম বিপদ কত আসে, প্রতি বৎসরই কত মাঝি অমনি ডুবিয়া যায়; কিন্তু তাহার আর কি করা যাইবে? যে জল হইতে তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জন হয় সেই জলে দু'একজনের মৃত্যু হইবেই। পদ্মার ক্ষুধা মিটাইতে হইবেই।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন ভৈরব বাড়ীর কাছাকাছি আসিল, তখন সে অন্ধকারে হঠাৎ একজন লোকের মুখোমুখী পড়িয়া গেল। লোকটি তাহার বাড়ীর দিক হইতেই আসিতেছিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে প্রশ্ন করিল, "কেডা?"

লোকটি দাঁড়াইল না, চলার বেগ আরও বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"আমি।"

ভৈরব মনে মনে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আরে আমি কইলেই ত' চলব না, 'আমি' কেডা?"

লোকটি উত্তর দিলনা, ভৈরব পিছু পিছু গিয়া ধরিলে পর তখন বলিল—"আমি সাধুচরণ।"

ভৈরব বলিল, "ও, তা কইথনে আইত্যাছ?"

একটু থতমত খাইয়া সাধুচরণ বলিল, "রজনীর বাড়ীথিক্যা।"

"ওঃ"—

সাধুচরণ চলিয়া গেল। সন্দিহান দৃষ্টিতে ভৈরব একবার তাহার

গমনপথের দিকে তাকাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। সাধুচরণ ছোকরাকে সে বরাবরই সহ্য করিতে পারে না। ছোকরা দুশ্চরিত্র বলিয়া গ্রামে বদনাম আছে। কাদাপাড়ার ফুলীকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে সে এক বৎসর জেল খাটিয়া মাসখানেক হইল গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ ভৈরবের কি একটা খেয়াল হওয়াতে সে রজনীর বাড়ী গেল। রজনী বাড়ী ছিল না, তাহার মাকে সে প্রশ্ন করিল, খুড়ী, তোমাগোর এই খানে সাধুচরইনা আইছিল নাকি ?"

রজনীর মা মাথা নাড়িয়া বলিল "না তো, আর এ হারামজাদারে এহানে আইতে আমি দিমু নাকি—হুঁ"—

ভৈরব আর কোনও কথা না বলিয়া বাড়ী ফিরিল। তাহার মনে হঠাৎ সন্দেহের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কি একটা চিন্তা মাথায় আসিতেই তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া ডাকিল, "বৌ, ও বৌ।"

দরজা বন্ধ ছিল, করাঘাত করিতে করিতে সে আবার ডাকিল, "শুনস্‌না, বৌ—অ বৌ"।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে এবার সদু ভিতর হইতে উত্তর দিল, "যাই—", দরজা খুলিয়া সে হাসিয়া বলিল, "পাক অইয়া গিছে, বইস্যা থাকতে থাকতে ঘুমে ধরছিল।"

ভৈরবের মাথার দুশ্চিন্তাগুলি নিমেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, সে-ও হাসিয়া বলিল, "পাক অইচে ? ভাল, চল্ খাইবার দিবি—উঃ ! কি খিদাই যে লাগ্‌চে।"

আকাশে ভাঙ্গা মেঘের মধ্য দিয়া আধফালি কুমড়ার মত চাঁদকে দেখা যাইতেছিল। জলে সিক্ত হিজল আর নারিকেল গাছের পাতায় পাতায় রূপালী আলোর চক্‌মকানি। পিছনের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রাম ডাক।

বিছানায় শুইয়া সদু প্রশ্ন করিল, "এবার নাকি খুব জল বাড়ত্যাছে গো?"

ভৈরব পান চিবাইতে চিবাইতে উত্তর দিল, "হ'—সোনাডাঙ্গা, মীরপুর, আকুণ্ডাইল—এই সব গেরামই একেবারে ডুইবা গ্যাছে, আমাগোর খালও ত' ভাইঙ্গা গেল বইলা"—

সদু সশঙ্কভাবে প্রশ্ন করিল, "আমাগো গেরামও ডুবুব নাকি?"

"না, তবে জল যে বাড়বই এটা ঠিক্।"

সদু ভীতকণ্ঠে বলিল, "ওমা, কি কও! যদি বেবাক ডুইব্যা যায়?"

ভৈরব দুইহাতে সদুকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। সদুর উত্তপ্ত ও কোমল দেহের স্পর্শে মাঝির সারাদিনের ক্লান্ত শরীরে রক্তধারা আবার উদ্দাম হইয়া উঠিল। সহরের শিক্ষিত লোক ভৈরব নয়, সুতরাং প্রেমের সূক্ষ্ম রহস্য সে জানে না—বোঝে না, মানসিক বিশ্লেষণের কোনও ধারই সে ধারে না। সে সদুকে ভালবাসে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমস্ত উগ্রতাভরা সে ভালবাসা। আর সেই ভালবাসার গুঞ্জনধ্বনি সে করে সদুর দেহকে ঘিরিয়া, সদুর দেহই তাহার নিকট আসল, তাহারি উদ্দেশে তাহার প্রেমের স্তুতি, মনের খোঁজ সে বড় একটা রাখে না।

ডিবাটা নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, জানালাটা দিয়া ঘরের ভিতর যে এক রেশ চাঁদের আলো প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই স্পর্শে সদুকে বড় সুন্দর দেখায়। তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ভৈরব স্নেহের সহিত বলিল, "ডরাস্ ক্যান বৌ, আমি থাকতে ডর ডর কিসের লো? হেই রকম কিছু অয় তো আর এ্যাক গেরামে না তো তর' বাপের বাড়ী যামু গিয়া"—বলিয়াই সে সদুর মুখটা তুলিয়া ধরিয়া নিজের মুখটা আগাইয়া লইয়া গেল, কিন্তু সদু একহাতে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া বলিল—"না।"

ভৈরব বড় কৌতুক অনুভব করিল, "না ক্যান, রাগ করলি নাকি ?"

"না তো।"

"তবে ?"

"হগ্‌গল সময়েই কি ভাল লাগে ?"

ভৈরব হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ভাল লাগে না ? আচ্ছা আমার দিকে একবার চাইয়া দেখ্‌—চা—"

বলিষ্ঠ বাহুর নিকট সদুকে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইল, ভৈরবের চুম্বনতলে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। কিন্তু ভৈরব হঠাৎ চুম্বন করিয়া অনুভব করিল সদুর প্রতিদানের শৈথিল্য, অন্যদিনের মত তাহাকে নিবিড়ভাবে সে আলিঙ্গন করিল না, চুম্বনে সে উত্তাপও নাই। অথচ এমনি ত' হাসিয়া কথা বলিতেছে! আর সদু ত রাগও করে নাই।

ভৈরব আর বেশী ভাবিল না। বর্ষার রাত্রিতে চাঁদকে নিত্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, চাঁদ থাকিলেও সে হয়ত বাড়ী থাকে না, তাহা ছাড়া তাহার রক্তধারাও আজ লুব্ধভাবে চলাফেরা করিতেছে, সুতরাং ভাবনা বিসর্জিত হউক।

পরদিন ভোরবেলায় সে যখন বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় জমিদারের নায়েবের লোক আসিয়া বলিল, "কত্তা জিগাইতেছেন তেনারে লইয়া মনসাপোতা যাইতে পারবা কিনা ?"

যাইতে না পারার কোনই কারণ নাই, ভৈরব তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল। ভিতরে গিয়া সদুকে সে বলিল, "ওলো বৌ, শুনচস্‌নি, আমি নাও লইয়া মনসাপোতা চল্লাম, আইজ আর ফিরমু না।"

সদু ঘর লেপিতেছিল, মাথা তুলিয়া বলিল, "আইজ কা ফিরবানা ?" তাহার কণ্ঠস্বর যেন কাঁপিয়া উঠিল।

"না।"

"কাইল আইবা তো ?"

ভৈরব মাথা নাড়িয়া বলিল, "হ। তা ডরাস্ ক্যান? রজনীর মা তর সঙ্গে রাত্তিরে শুইবনে।"

সদু উষ্ণভাবে বলিল, "আমার ডর করে—কেডা কইল শুনি?"

ভৈরব হাসিয়া বলিল, আরে তরা মাইয়ালোক মানুষ, বোঝস্ না ?"

মাথা নাড়িয়া সদু মুখ ভেংচাইল—"থাউক, থাউক—আর কথা কওনের কাম নাই।"—সদু এখনও ছেলেমানুষের মত।

দ্বিপ্রহরের সময় নায়েবকে লইয়া ভৈরব আর রাখাল যখন পলাসোনা গ্রামের পাশ দিয়া যাইতেছিল, তখন নায়েব মশাই হঠাৎ মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ভৈরব, পলাসোনা বুঝি রে?"

ভৈরব বলিল, "আইজ্ঞা হ' কত্তা।"

নায়েব একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে বাজারের ঘাটে আইজকার মতন নৌকার পারাগাড় রে—"

ভৈরব বলিল, "ইটা কি কন! মনসাপোতা না বলে যাইবেন?"

নায়েবমশাই বাধা দিলেন, "না, আইজ আর যামু না, এইখানে আমার এক পিসাত বইন আছে—তারে অনেকদিন দেখি না।"

ভৈরব নৌকা ভিড়াইল। নায়েবমশাই ভাড়া দিতে দিতে বলিলেন, "আইজ তরা থাকবি তো ?

একটু ভাবিয়া বলিল, "না কত্তা।"

রাখাল হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না কেন ভৈরব অস্বীকৃত হইতেছে, সে অনুযোগ করিয়া বলিল, "কিয়ের লাইগ্যা এই পনর কোশ আবার লগ্গি ঠ্যালবা ভৈরবদা?"

ভৈরব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, "না আইজই গেরামে ফিরুম,। বাসাত আছে, বাদাম টাইনা দিলে এহনই উইড়া যাইবোনে।"

রাখাল নায়েব মশাইএর বাক্স ও বিছানা মাথায় বহন করিয়া তাঁহাকে পৌঁছাইতে চলিল। ভৈরব রান্নার উদ্যোগ করিতে লাগিল, সকালে সে পান্তাভাত খাইয়া বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড ক্ষুধা পাইয়াছে। আগুন ধরাইতে ধরাইতে সে ভাবিতে লাগিল। রাখালের ইচ্ছা যে আজ এখানে থাকিয়া ডবল উপার্জ্জন করে, কিন্তু ভৈরবের আজ যেন কেমন একটা অস্বস্তিভাব মনের মধ্যে; তাহার কেন যেন আজ সত্বর নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার মনটা শুধু আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল।

দুইঘণ্টা পরে পালভরে নৌকা আবার ফিরিয়া চলিতেছিল। রাখাল হাসিয়া বলিল, "আইচ্ছা রকম বৌ'য়ের আঁচল ধরা লোক তো তুমি ভৈরবদা।"

ভৈরব হাল ধরিয়াছিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করিল, "ক্যান ?"

রাখাল তেমনি হাসিমুখে বলিল, "তা না অইলে দুইডা ট্যাকা ছাইড়া দিলা, ক্যান ?"

ভৈরব হাসিয়া উঠিল, "ওঃ—আইচ্ছা—আইচ্ছা, দেখুমনে তর এউক্কা টুকটুইকা বৌ আইলে কি করস্ তুই! বৌ যে কি জিনিষ তা' তুই বুঝবি ক্যাম্‌নে? হাঃ হাঃ হাঃ—"

রাখাল লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বিবাহের কথা কেহ বলিলেই তাহার বড় লজ্জা লাগে।

ঘণ্টা তিনেক পরে যখন তাহারা ঈশানপুরের কাছাকাছি আসিয়াছে, এমন সময় তাহাদের আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়িল। উত্তর দিক হইতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের মেঘের রাশি আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বাতাস একটুও নাই, পালও পড়িয়া গিয়াছে।

রাখাল বলিল, "দেওয়ার গতিক ভাল না, তুফান আইতে পারে।"

ভৈরব কোনও উত্তর না দিয়া দাঁড় টানিতে লাগিল।

কিন্তু তাহারা আধঘন্টাখানেক অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি নামিল আর সঙ্গে আসিল ঝড়। পালটা খুলিয়া ফেলা হয় নাই, হঠাৎ দমকা বাতাসের বেগে তাহা ফুলিয়া উঠিল নৌকাটা সেই বেগে হেলিয়া দুলিয়া সোজা, তীব্রবেগে, ডানদিকে কাৎ হইয়া ছুটিল ;—রাখালের দৃঢ় মুষ্টিকেও বোকা বানাইয়া হালটা বারকয়েক ঘুরিয়া গেল।

ভৈরব বলিল, "সামলে সামলে, সকালে বাদাম নামাইয়া ফ্যালা।"

কিন্তু খুলিতে যাইবার পূর্ব্বেই পালের একটা কোণ ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িল, নৌকার গতিবেগ ইহাতে একটু প্রতিহত হইয়া ডান দিকে আরও বেশী কাৎ হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় তরঙ্গ পাটাতনের উপর ছিটকাইয়া পড়িল। অতিকষ্টে পাল খুলিয়া ভৈরব নৌকার ভিতরের জল সেচিয়া বাহির করিয়া দিতে লাগিল। অন্ধকার ও বৃষ্টির ধারাতে দশহাতের পরে আর দৃষ্টি পৌছায় না, হারিকেনের ক্ষীণ আলোকেও বেশী কিছু পরিষ্কার দেখায় না। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকায় আর তাহাতে দেখা যায় মত্ত দানবীর মত ক্ষিপ্তা পদ্মার বিরাট জলরাশির অনন্ত তরঙ্গ সকলের চাঞ্চল্য। বজ্রপাতের শব্দ, মেঘগর্জ্জন আর গম্ভীর জলকল্লোলের ধ্বনি মিলিয়া কাণে তালা লাগিয়া যায়, কিন্তু তবুও ভাল লাগে। স্রোতের বিরুদ্ধে, তরঙ্গ প্রতিহত করিয়া নৌকা চালনা করিতে হাতের মাংস পেশীগুলি ব্যথায় টন্‌টন্ করে, তবু বড় ভাল লাগে। এই অসীম জলরাশির উপর দিয়া সে নিত্য যে জীবন যাপন করে, তাহাতে যে কবিত্ব আছে তাহা ভৈরব কোনও দিন বুঝিতে পারে না, শুধু সে এইমাত্র উপলব্ধি করে যে ইহাতে অনেক বৈচিত্র্য আছে। জল সেচিতে সেচিতে সে বলিল, "বাঁয়ে ভিড়াইয়া চল্‌রে রাখালে—"

জলে, ঘামে, কাদায় একাকার হইয়া, ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া, তাহারা যখন অবশেষে গ্রামে পৌছাইল, তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। রাখাল নিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়াইল। জলে ভিজিয়া যাওয়ায় হারিকেনটা জ্বালানো যায় নাই, তাহা লইয়া ভৈরব বাড়ীর দিকে চলিল। বৃষ্টি থামে নাই, একই ভাবে পড়িতেছিল। খালের জল বাড়িয়া তাহার বাড়ীর দিকের রাস্তাটা পর্য্যন্ত গিয়াছে—সেই জল ভাঙ্গিয়া সে চলিল।

বাড়ীর দাওয়ায় উঠিয়া সে দেখিল, ভিতরে বাতি জলিতেছে। তাহার কৌতূহল জন্মিল, এত রাত্রেও সদু জাগিয়া রহিয়াছে নাকি? বেড়ার একটি ছিদ্রপথে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। এক মুহূর্ত্তে কি যেন হইয়া গেল। ভৈরবের সারা অঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দৈত্যের মত বলিষ্ঠ দেহটা অবশ হইয়া পড়িল, কণ্ঠ গেল রুদ্ধ হইয়া, বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে একটি অন্ধকার যবনিকা আত্মপ্রকাশ করিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল। বসিবার সময় লণ্ঠনটি হস্তচ্যুত হইয়া মাটির সিঁড়ির ধাপ দিয়া গড়াইয়া সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল।

বেড়ার ছিদ্রপথ দিয়া ভৈরব দেখিতে পাইয়াছিল যে বিছানার উপর সদু'র নগ্ন বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া সাধুচরণ হাসিতেছে।

হারিকেন পড়ার শব্দে ঘরের ভিতরের বাতি নিভিয়া গেল।

নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ভৈরব উঠিয়া দাঁড়াইল, অবশ ভাবটা কাটিয়া যাইতেই তাহার দেহ ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল, সমস্ত জীবনের ভালবাসা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ, অন্ধকার বর্ষাবিক্ষুব্ধ রাত্রির মতই ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ঘৃণা আর হিংসায় তাহার চক্ষু দুইটা শ্বাপদের মত জলিতেছে। জ্ঞান ফিরিতে তাহার মনে পড়িল যে

ভিতরে সাধুচরণ তাহার স্ত্রীকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। তাহার মাথায় খুন চাপিয়া যায়। পদাঘাতে দরজা আহত করিয়া সে সগর্জ্জনে ডাকিল—"কবাট খোল"—

কোনও উত্তর আসিল না। ভৈরবের ক্রোধ বাড়িয়া গেল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া অতি কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিয়া সে আবার দরজায় পদাঘাত করিয়া বলিল, "এই মাগী—দরজা খোলস্ না ক্যান ?"

এইবার সদুর ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, "আইচ নাকি ? এই খুল্ত্যাছি—"

দরজা খুলিয়া সদু ডিবা জ্বালাইল—তাহার আলোকে ভৈরব দেখিল যে ঘরের মধ্যে কেবল সদুই একা রহিয়াছে। একবার তাহার এই মিথ্যাটাকেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল, কারণ সে সদুকে ভালবাসে সমস্ত রক্তপ্রবাহ দিয়া। কিন্তু সত্য বড় রূঢ়, যে দেহকে সে পূজা করে, সেই দেহটা সে আজ অন্যের কুরায়ত্ত দেখিয়াছে ; মিথ্যাকে বিশ্বাস করিবার মত শক্তিও তাহার আর নাই। এই তের বৎসর যাবৎ সদু কি এইরূপ গুপ্তপ্রেম বরাবর করিয়া আসিতেছে ? স্বপ্নেও ত' সে কোনও দিন কল্পনা করিতে পারে নাই যে এই সদু তাহার দেহকে, অন্যের মত অপর একজনকে দান করিবে।

ভৈরব একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। সদু তক্তপোষের একপার্শ্বে বসিয়া মূকভাবে ভৈরবের দিকে আড়নয়নে তাকাইয়া ছিল। স্বামীকে দেখিয়া ভয়ে তাহার রক্ত জল হইবার উপক্রম হইল। ভৈরবের নাকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে, বিশাল লোমশ বক্ষদেশ বারংবার ফুলিয়া উঠিতেছে, চক্ষে উদ্‌ভ্রান্ত হিংস্রতা।

ভৈরব প্রশ্ন করিল, "রজনীর মায় তর লগে শোয় নাই ক্যান ?

নতমুখে সদু জবাব দিল, "সে আহে নাই।"

ভৈরব একেবারে লাফাইয়া উঠিল, "হারামজাদী—মিছা কথা কস্! সে আছে নাই, না তুই তারে আইতে না করচস্?" হঠাৎ স্বর নীচু করিয়া অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া বলিল, "সাধু চরইনা কই?"

সদু চমকিয়া মুখ তুলিল, মুখ তুলিতেই ভৈরবের চক্ষের সহিত তাহার চোখাচোখী হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ মুখ আবার নামাইয়া কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "আমি তার কি জানি—"

ভৈরব কি যেন ভাবিল, একটু চুপ করিয়া সদুর দিকে একপদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "সাউদা আইচিল, এই একটু আগেই তর কাছে সে হালার পো শুইয়া ছিল, আমি সে সব জানি। এখন ক' দেখি ঐ উল্লুকটা গ্যাল কোনহানে—খবরদার, মিচ্ছা কথা কইস্ না।"

সদু নির্ব্বাকভাবে বসিয়া ঘামিতে লাগিল।

বাহিরে বৃষ্টি আর ঝড় সমান বেগে চলিয়াছে। ভৈরবের বুকের মধ্যেও যেন ঝড় উঠিয়াছে, একবার সে ঝড়ের বেগ কমিয়া যায়, আবার তাহা বাড়িয়া যায়। সে আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বলি কদ্দিন ধইয়া তোমাগোর এই পিরীত চল্ত্যাছে—কি গো চাঁদবদনী —কও?"

সদু ভৈরবের ভৈরবমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। সে একটু নড়িলও না, কথাও বলিল না, নতমুখে ঠায় একভাবে বসিয়া রহিল।

ভৈরবের ক্রোধ উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। আর একপদ অগ্রসর হইয়া সে সদুর একটি হাত ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল, আর এক হাতে তাহার বুকের বসন খুলিয়া ফেলিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—"তোমার এই বুকের উপর মাথা রাইখ্যা যিনি তোমারে সোহাগ করত্যাছিলেন তেনার লগে তোমার কদ্দিন ধইরা পিরীত চল্ত্যাছে রে হালী?"—

সদু শুধু কাঁপিতে লাগিল, উত্তর দিবার শক্তি তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভৈরব দেখিতেছিল সদুর নগ্ন বক্ষ, মুখ। সেই একই দেহ। নিখুঁত, যৌবন দৃপ্ত, বলিষ্ঠ। এই দেহের প্রতিটি স্তরকে সে চিনে, ভালবাসিয়াছে, অথচ এই দেহটা আজ তাহার অধিকারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া সম্ভব হইল? সাপের মত খল যে মনটা এই দেহের অন্তরালে রহিয়াছে, তাহাকে কি সে তৃপ্ত করিতে পারে নাই? না পারিলই বা, সে তাহার স্বামী, একথা সদু ভুলিল কেন? না, ক্ষমা নাই।

একটি প্রচণ্ড চড়ে, সদুর চক্ষু বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দাঁতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে ভৈরব বলিতে লাগিল, "বেশ্যা মাগী, তর এই কাণ্ড! তরে না ভালবাসতাম! কিলো হারামজাদী, কথা কস্ না ক্যান্—এঁ্যা?"—

অতি কষ্টে, কাঁদিতে কাঁদিতে সদু বলিল "ক্যান এমন করত্যাছস্, আমি তর কি করচি?"

ভৈরব আর সহ্য করিতে পারিল না। থাক, সাধুচরণের বিচার কাল তাহার রক্ত লইয়া সে করিবে। আজ এই বিশ্বাসহন্ত্রী ভ্রষ্টার বিচার। তাহার মাথাটার ভিতর কি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল, জ্ঞান বিবেক সব লুপ্ত হইয়া গেল। দুই হস্তে সে সদুর গলা টিপিয়া ধরিল। সদু কয়েকবার ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, একবার চীৎকার করিতে চাহিল, কিন্তু কিছুই পারিল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যে তাহার অচেতন দেহটা মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভৈরব অস্ফুট স্বরে বলিল, "যাউক সব শ্যাষ হইচে—সদু মরচে—"

ডিবাটি নিকটে লইয়া সে একবার সদুর অর্দ্ধনগ্ন দেহের প্রতি তাকাইল। সেই একই দেহ। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার চক্ষু

ছাপাইয়া জল আসিল। সতুর দেহের উপর অপরিসীম বেদনার সহিত হাত বুলাইল। যেখানে সাধুচরণ মাথা রাখিয়াছিলেন, সেইখানটাতে সে একটি প্রগাঢ় চুম্বন আঁকিয়া দিল, যেন সে সতুর দেহের অদৃশ্য কলঙ্ক কালিমা নিজে লেহন করিয়া লইল। কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, পরে দরজায় শিকল লাগাইয়া নিঃশব্দপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আবার খালের দিকে অগ্রসর হইল।

অন্ধকারে হাতড়াইয়া, আন্দাজে, নিজের নৌকাটা খুলিয়া সে তাহাতে উঠিয়া বসিল—তারপর খাল ছাড়াইয়া পদ্মাতে গিয়া পড়িল। স্রোতমুখে নৌকা মধ্যের দিকে অগ্রসর হইল। নিঃসাড়ের মত সে বসিয়া রহিল, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল বর্ষার পদ্মার গর্জ্জন, মেঘের ডাক, আর বজ্রের হুঙ্কার। বিদ্যুৎচমকে সে দেখিতে লাগিল —অনন্ত তরঙ্গের মত্ত গতিভঙ্গী—ঘূর্ণাবর্ত্তের বিপুল প্রসার, ফেণরাশির নৃত্য, ভাসমান দগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ড;—সমস্ত বাহ্য জ্ঞান সে তখন হারাইয়াছে।

পরদিন সকালে সকলেই সতুকে জীবিত দেখিয়াছিল, যেমন অন্যান্য দেখিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা কিছুই ভাবে নাই। আরও তিন চার দিন পরে, ক্রোশ দশেক দূরে, বিশালাক্ষীর চরে একটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিগলিত মৃতদেহ। তাহার পেটের দিকটা শিয়ালে খাইয়া ফেলিয়াছিল।

রাত্রি

টগর সাজিতে বসিল।

ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন, পূবের আর্দ্র বাতাসে একটু শীত বোধ হয়। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সময় হইয়াছে।

সময় হইয়াছে বৈকি। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ বরং একটু দেরী হইয়াছে, টগর আজ বেশীক্ষণ ঘুমাইয়াছে। পান্না আসিয়া বার দুয়েক তাহাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে উঠে নাই। হ্যাঁ, সময় হইয়াছে বৈকি।

বহুদিনের পুরাতন ষ্টোভের উপর চায়ের পাত্রটা চড়াইয়া দিয়া টগর সাজিতে বসিল।

সেই পুরাতন সাজ। সাত বৎসর প্রত্যহ সে একই ধরণের সাজ করিয়াছে। জড়ির পাড়ওয়ালা নীল সাড়ি, গিল্টি করা গহনা, ললাটে একটি খয়েরের টিপ, চোখের কোণে কাজলের সূক্ষ্ম রেখা, পায়ে আলতার ঘন প্রলেপ, সস্তা পাউডার আর 'দিলবাহার' এসেন্স।

সাজসজ্জা শেষ হইলে টগর দেওয়ালে বিলম্বিত বড় দর্পণটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক আছে। নিত্যকার রাত্রি জাগরণে চোখের কোণে কালো ছায়া ঘন হইয়াছে, অলক্ষ্যে সময় তাহার ললাটে দুর্বোধ্য রেখায় কি যেন লিখিয়াছে, দেহ হইয়াছে ঈষৎ মেদবহুল, বক্ষ আর কটিদেশ আগেকার মত আকর্ষণীয় নয়, তবু চলিবে। এখনও আরও কিছুদিন চলিবে।

চায়ের জল টগ্‌বগ্ করিতেছে।

"আমায়ও এক কাপ দে ভাই"—মানদা আসিয়া দাঁড়াইল। মানদা প্রৌঢ়া, স্থূলাঙ্গী, মুখে বড় বড় বসন্তের দাগ, রংটা শ্যামবর্ণ। এককালে তাহার চেহারা ভালই ছিল, আর ব্যবসাও চলিত ভাল, কিন্তু আজকাল—।

"বোস ভাই"—টগর বলিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরে সে প্রশ্ন করিল, "শশী কোথায় মানদা?"

মানদা ঠোঁট উল্টাইল, "সে হারামজাদার কি আর কোন জ্ঞানগম্যি আছে—কাল রাত থেকেই ত' উধাও।"

টগরকে একটু চিন্তিত বোধ হইল; "আজ মুখপোড়া গেল কোথায় কে জানে।"

মানদা মুচকি হাসিয়া বলিল—"জানিস, হতভাগা তোকে ভালবাসে?"

টগর হাসিল। ভালবাসা! বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা—সুধীর নামক একটি সুদর্শন যুবক বিমলাকে ভালবাসিত। সেই বিমলা আজ টগর হইয়াছে—আর সুধীর?

চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া মানদা বলিল, "যাই ভাই, আমিও তৈরী হইগে।"

মানদা চলিয়া গেল। এখন আর তাহার সেদিন নাই, একটি লোকও তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় না, আর সকলের দাসীবৃত্তি করিয়াই সে আজকাল বাঁচিয়া আছে; তবুও অন্যান্য সকলের মত সেও সাজিয়া গুজিয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়ায়, পথগামী লোকদের প্রতি কটাক্ষ হানে, রসিকতা করে, অশ্লীল কথা বলে। রক্তের মধ্যে অভ্যাসটা যেন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

টগর বসিয়া রহিল। শশীর ভালবাসা! এবার আর—হাসিল

না। ধীরে ধীরে তাহার দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া উঠিল, পাউডারে অবলিপ্ত ললাটের রেখাত্রয় আবার পরিস্ফুট হইল, চোখের কোণের কাজলের রেখার উপর একবিন্দু জল টলমল করিতে লাগিল। ভালবাসা! সে কবেকার কথা—!

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। মেঘ্‌লা দিনের আলো। সেই আলো যেন হঠাৎ অন্ধকারে পরিণত হয় আর সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়াছবির মত কতকগুলি ছিন্নভিন্ন ছবি ভাসিয়া যায়, কতকগুলি পুরাতন কথা পুনর্জীবন লাভ করে।

সুধীর বলিল, "বিমলা, তোমায় আমি ভালবাসি।"

বিমলা লজ্জায় অধোবদন হইল।

বাহিরে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশের মেঘে মৃত সূর্য্যের শোণিত চিহ্ন।

সুধীর বলিল, "বিমলা, তুমি আমার"—

বিমলা বলিল, "আর তুমি আমার।"

গলিতে ভীড় বাড়িতেছে। বিসর্পিল গলি।

গলির মোড়ে কানাইয়ের মাংসের দোকান। পূবের ঠাণ্ডা বাতাসে মাংসের তরকারীর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

সুধীরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ বিমলা।

সুধীর বলিল, "বিমলা, চল—পালিয়ে যাই।"

বিমলা বলিল—"চল"—

তাহার পর এক নগর। সেখানে স্বপ্নভঙ্গ। পাখী উড়িল। মাতৃত্বের ভারে বিমলাকে ভারাক্রান্ত করিয়া একদিন সুধীর অদৃশ্য হইল। তারপর নূতন নূতন লোলুপ মুখ আর ক্ষুধিত দৃষ্টির মাঝে একটি শিশুর কান্না শোনা গেল। তারপর—

"ছি লো! গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌ছিস, ভাই?"

চমক ভাঙ্গিল। বুঁচী। সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিয়াছে, গলির বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মানুষের ভীড় বাড়িয়াছে। তাহাদের হাসির শব্দ আর কোলাহল শোনা যায়।

"বলি কি ভাবছিস্ লা পোড়ারমুখী ?"

টগর হাসিল—"তোর কথা রে বুঁচী।"

বুঁচী নিজের গোলমুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটাইয়া বলিল, "যাঃ মাইরি—ইয়ার্কি করিস্না। বল্ না ভাই—

কোন সে পুরুষশ্রেষ্ঠ হরিয়াছে
চিত্ত তব দেবেন্দ্রযোগ্য ?"—

বুঁচী কোন থিয়েটারে একবার এক সখীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিল। তাহার অভিনয় প্রথমবারেই শেষবারে পর্য্যবেসিত হইয়াছিল, যেহেতু সে ষ্টেজে নামিয়া একটি কথাও বলিতে পারে নাই, অনেক লোক দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু ষ্টেজে যে কথা তাহার বলা হয় নাই, তাহা প্রায়ই বেশ সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়া মাঝে মাঝে টগর পান্না প্রভৃতিকে কারণে অকারণে শোনায়।

টগর হাসিল। বেশ মেয়ে এই বুঁচী।

বুঁচী আবার বলিল—"কি, বলি কোন মনচোরের কথা ভাবছিলে ?"

মনচুরি! সে ভুল একবার হইয়াছিল। সে কবেকার কথা! তাহার পর 'পুরুষশ্রেষ্ঠ' নয়, বহু পুরুষ আসিয়াছে, নিত্য নূতন। বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ়। সুস্থকায় আর ব্যাধিগ্রস্ত। এখনও আসে, নিত্য তাহার চতুর্দ্দিকে তাহারা ভীড় করে, গুঞ্জনধ্বনি তোলে। টগরের নয়, বিমলার মন একবার চুরি গিয়াছিল বটে। কিন্তু সে হতভাগী ত' আর বাঁচিয়া নাই।

"বুঁচী"—

"কি প্রাণেশ্বর ?"

"আর বাজে কথা বল্লে চল্‌বে না।"

"কেন হৃদয়বল্লভ ?"

"সবাই চলে গেছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ্।"

বুঁচীর জ্ঞান হইল; "তাই ত! চল্ চল্"—

ফটকের সামনে গিয়া তাহারা দাঁড়াইল। ল্যাম্প পোষ্টের আলোতে তাহাদের দেহ আর পোষাক আর গিল্টির গহনাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। আলোর ইন্দ্রজাল।

রাত্রি হইয়াছে। তাহাদের জীবন আরম্ভ হইল।

তাহারা সকলে দাঁড়াইল—এক বাড়ীতে তাহারা পাঁচজন থাকে। মানদাও দাঁড়াইয়াছে!' রক্তের মধ্যে অভ্যাসটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

পান্না হাসিয়া বলিল, "মাইরি টগর, তোর রূপের দিন দিন খোলতাই হচ্ছে!"

টগর নিরুত্তরে হাসিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল রাধার দিকে। এককোণে সে গম্ভীরভাবে একটা সাদা সাড়ী পড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। টগর বিস্মিত হইল।

"রাধা"—সে ডাকিল।

রাধা তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"তুই এলি যে, আজই না তুই পথ্যি করেছিস ?"

রাধা শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ"—

"কেন এলি তবে ?"

"টাকা চাই, বাড়ীউলি আজ আমায় অনেক কথা শুনিয়েছে।"

টগর আর কি বলিবে ?

রাধা চলমান জনতার দিকে দুইটি বড় বড় চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রোগ ভোগের পর তাহার শীর্ণ আকৃতি অধিকতর শীর্ণ হইয়াছে, কালো রং মিশ্ কালো হইয়াছে, গাল ভাঙিয়া গিয়াছে আর মাথার চুল কিছু উঠিয়া গিয়াছে। রাধার বুকে নাকি কি এক দুর্ব্বোধ্য ব্যাধি হইয়াছে, জীবনের আশা খুব কম, শ্বাস প্রশ্বাস লইতে তাহার আজকাল বড় কষ্ট হয়। পরেশ ডাক্তার তাহাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়াছে।

প্রেতিণীর মত মাংসহীন, লিক্‌লিকে একটি বাহু দিয়া দরজার পার্শ্বদেশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাধা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। টাকা চাই।

কনক বলিল—"সত্যি তুই শুয়ে থাক্‌গে লো রাধা, এখনও আরও কয়েকদিন তোর জিরোন উচিত।"

রাধা নড়িল না, কথাও বলিল না।

"বিবিসায়েব, গোলামের সেলাম নাও।"

একটি কালো ও মোটা লোক। গায়ে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে লপেটা।

পান্না একগাল হাসিয়া আগাইয়া গেল—"মর মিনসে, কত ঢংই জান, চল ভেতরে।"

লোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পান্না তাহাকে ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

গলিতে ভীড় ক্রমে বাড়িয়া উঠে। নানারকমের এসেন্স, পাউডার আর দেহের গন্ধ। নানারকমের মুখ, পোষাক আর কথা। হাসি আর পানের পিচ আর সিগারেটের ধোঁয়া।

"ঐ মেয়েটা মন্দ নয়।"

"কোনটা?"

"ঐ যে কোমরে হাত দিয়ে—আহাহা, শরীরের গড়নটা দেখছিস !"

একটি যুবক এদিক ওদিক একবার ত্বরিতগতিতে দেখিয়া লইয়া টগরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"শোন"—সে বলিল।

"আমায় বল্‌ছেন ?" টগর হাসিল।

বুঁচী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "মর ছুঁড়ী—আর কাকে না ?"

যুবকটি ঘামিয়া উঠিয়াছে। সে এ গলিতে নবাগত।

"কি কথা, বলুন"—টগর নিপুণ কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিল।

"ভেতরে চল।"

"সে কি ? দরদস্তুর !"

"সে পরে হবে।"

সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কেবল রাধা হাসিল না।

নিজের ঘরে গিয়া টগর বলিল, "বসুন।"

যুবকটি সলজ্জভাবে বসিল। পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া সে ঘন ঘন টানিতে লাগিল।

"পান খাবেন ?" টগর প্রশ্ন করিল।

"না।"

একদৃষ্টে যুবকটি তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বারংবার তাহার নাসিকা স্ফীত হইতে থাকে। সুদর্শন, সুকুমার যুবক। টগর মনে মনে হাসে। নূতন পথিক।

"কতদিন এপথে এসেছো ?"

টগর শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে বলিল, "ওসব জেনে কি করবেন—দেবদাস হবেন নাকি ?"

যুবক অপ্রতিভ হইল—"না-না, মানে"—

"থাক ওসব কথা, বাতি নিভিয়ে দেব ?"

সিগারেট বারান্দায় নিক্ষেপ করিয়া শয্যায় বসিয়া যুবক কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দাও !"

"আগে দু'টো টাকা দিন।"

দুইটী টাকার আওয়াজ। অন্ধকার হইল।

অন্ধকারে উষ্ণ রক্তের মত্ত ইতিহাস। নিবিড় আলিঙ্গনে টগরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, দেহগ্রন্থিগুলি টন্‌টন্ করে।

বারান্দায় সিগারেটটা নিভিতে চলিয়াছে।

আলো জলিল।

যুবকটির মাথা নত। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, অবিন্যস্ত চুলে একবার হাত বুলাইয়া সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

"একটা সিগারেট দিন ত"—টগর বলিল।

যুবকটি তাহার দিকে চাহিল না, কেবল নিরুত্তরে একটি সিগারেট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া টগর বলিল, "বসুন।"

"না"—পাপের অবসাদ তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

"আমার জীবনকাহিনী শুনবেন না ?"

যুবক মাথা নাড়িল।

"কালকে আসবেন ত ?"

যুবক লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

টগর হাসিল। সে জানে ঐ যুবক আবার একদিন আসিবে। এখন তাহার মাথা নীচু হইয়াছে বটে, কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থিত নিস্তেজ শিরাগুলি যখন আবার উষ্ণ রক্তের স্রোতোবেগে উদ্দাম হইয়া উঠিবে, মন তখন আবার বদলাইবে, সে আবার আসিবে।

বাতাসে কানাইয়ের দোকানের মাংসের গন্ধ। পাশের ঘরে পান্না

হাসিতেছে। ওপাশের বড় বাড়ীটায় সুকেশী গান ধরিয়াছে। মহানগরীর বুকে রাত্রি গভীর হয়।

আয়নায় মুখ দেখিয়া, খোঁপা ও বেশ ঠিক করিয়া লইয়া টগর সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

এমন সময়ে আসিল শশী।

সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠিয়া রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে হাসিল, "তোকেই খুঁজছিলাম টগর।"

টগর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কেন, কি দরকার আমার খোঁজে, এখন বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে?"

"না—তা নয়, দুটো পয়সা চাই।"

"ওপরে চল্।"

টগরের পিছনে শশী ঘরে ঢুকিল।

ঘরের আলোতে শশীর চেহারা এইবার পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। একটি সরুপাড় ময়লা সাড়ী পরণে, গায়ে একটা অর্দ্ধছিন্ন পাঞ্জাবী, মাথায় একরাশ ফাঁপিয়া ওঠা রুক্ষ চুল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহ তাহার অতিমাত্রায় দীর্ঘ, অস্বাভাবিক শীর্ণ, হাতের শিরাগুলি স্ফীত, লম্বাটে মুখের মাংসহীন দুইটী গালের উপর গরুর মত একজোড়া-ড্যাবডেবে ও ক্লান্ত চক্ষু।

পয়সা দিতে গিয়া শশীর দিকে ভাল করিয়া চাহিল, হৃদয়ে একটা ব্যথা মোচড় খাইয়াও উঠিল। হতভাগা শশী। কবে কোন এক বেশ্যার গর্ভে এই গলির এক অন্ধকার ঘরে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার আর মনে নাই, উদ্দেশ্যহীন ছন্নছাড়া জীবনের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়া সেই কথা সে ভুলিতে চায়। কোথায় যায়, কোথায় কখন থাকে, কি খায়, কিছুরই ঠিক নাই।

"বলি আজ খেয়েছিস্ ত?" টগর প্রশ্ন করিল।

ক্ষুদ্র শিশুর মত মাথা দুলাইয়া শশী বলিল, "হ্যাঁ।"

"কোথায় ?"

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া টগর বলিল—"আচ্ছা শশী"—

"এঁ্যা"—

"কেন মরতে এখানে থাকিস বল্ ত—অন্য কিছু করতে পারিস না ?"

শশীর শান্ত ও ক্লান্ত দৃষ্টিতে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, "এখানে যে নাড়ীর টান আছে।"

"না শশী, বাজে কথা নয়।"

শশী একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোদের মায়া ছাড়তে পারি না।"

"কেন ?"

শশী তাহার উত্তর দিল না, হঠাৎ একটা কথা যেন তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে এমনিভাব মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "আজ গণেশের ওখানে একটি ভারী অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হল টগর, বয়স বেশী নয় কিন্তু কি তার জ্ঞান! সে আমায় বল্লে"—সে থামিল।

"কি বল্লে ?"

"তার আগে একটা কথার উত্তর দে ত।"

"কি ?"

"এই জীবন কি তোর ভাল লাগে ?"

টগরের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিল, মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, "না, কিন্তু বাঁচতে হবে ত, অন্য আর কি উপায় আছে ?"

শশী মাথা নাড়িল, "লোকটি সেই কথাই বল্লে যে এমন একটা দিন আসবে যখন তোদের এ জীবনের আর দরকার হবে না, মানুষ আর সমাজ একদিন ভেঙ্গে পিষে নতুনভাবে তৈরী হবে।"

শশীর কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতে থাকে, কথা শেষ করিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

টগর ঠিক কথাগুলি বুঝিতে পারে না, তবুও অহা কেমন যেন ভাল লাগে। সমাজ আর মানুষ! ঠিকই ত'। মুহূর্ত্তে তাহার সারা অতীত আবার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু এই অতীতের স্মৃতিতে কোথায় যেন একটা পীড়াদায়ক যন্ত্রণা লুক্কায়িত আছে, টগর তাহা সহ্য করিতে পারে না। জোর করিয়া হাসিয়া সে বলিল— "আচ্ছা এবার নীচে চল্।"

শশী হঠাৎ তাহার দিকে আসিয়া দ্রুতকণ্ঠে, উত্তেজিত ভাবে বলিল "টগর"—

"কি?"

"চল্ না কোথাও বেরিয়ে পড়ি, এই কুকুরের জীবন, এই গলির ভ্যাপ্সা দুর্গন্ধ আর অন্ধকার ছেড়ে চল্না কোথাও চলে যাই। যাবি?"

টগর হাসিল, "তা আমাকে এত দয়া কেন রে মুখপোড়া, আরও ত' কত লোক রয়েছে—বুঁচী, মানদা, পান্না—তাদের বল্‌গে না।"

"তোকে যে ভালবাসি।"

"কি!" মানদার কথাগুলি টগরের মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ভালবাসার ছবিগুলি চোখের সামনে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিল, "ভালবাসা! যা যা শশী দূর হ, বেশ্যাকে ভালবাসতে এসেছেন, বলি কত টাকা আছে রে তোর হারামজাদা?"

শশীর বড় বড় চোখ দুইটি যেন এবার ফাটিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম হইল, "নাই বা থাক্‌ল টাকা, টাকাওয়ালাদের মত রাতের বেলায় এসে এক ঘণ্টার জন্য ত' তোকে ভালবাসি না আমি, আর বেশ্যার ছেলে আমি, বেশ্যাকে ভালবাসব না ত কাকে ভালবাসব?"

টগর বিরক্ত বোধ করে, "পথের কুকুর মাথায় উঠেছিস্ না? প্রেমের কথা শোনাতে এয়েছেন বাবু, বলি ভাত গিলিস, আজ কটা লোককে এনেছিল্ রে মুখপোড়া? যা যা দূর হ সুমুখ থেকে।"

মুহূর্ত্তে শশীর মুখের রূপান্তর ঘটিল, আবার পূর্ব্বেকার সেই নিরীহ পশুর মত ক্লান্ত ভাব ও দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল, "ঠিকই ত, বাইরে যে একটা বুড়োকে দাঁড় করিয়ে এসেছি।"

টগর একটু চুপ করিয়া বলিল, "যা—নিয়ে আয়।"

"যাই।"

লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শশী চলিয়া গেল। কেবল যাওয়ার সময় একবার কি ভাবিয়া টগরের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল। ঘরের আলো তির্য্যক গতিতে সিঁড়ির উপর পড়িয়াছে, তাহাতে সিঁড়িটা সম্পূর্ণভাবে আলোকিত হয় নাই। সেই আধো আলো, আধো অন্ধকারে শশীর গরুর মত ড্যাবডেবে চোখের মধ্যে যেন কি একটা ভাষা। টগর বুঝিয়াও বোঝে না। ভারী অদ্ভুত এই শশী, একেবারে পাগল।

টগর বিছানায় গিয়া বসিল। ঘরের ভিতর বর্ষাকালের ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। বাহিরে নক্ষত্রহীন অন্ধকার আকাশে মেঘরাশি আবার পুঞ্জীভূত হইতেছে। টগর ভাবে। ভালবাসা! শশীর ভালবাসা। সুধীর আর বিমলা।

সন্ধ্যাবেলায় অতীত জীবনের কথা চিন্তা করিতে করিতে যেখানে ছেদ পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে সে আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল—

—এক নগর। সেখানে হঠাৎ একদিন একটি শিশুর ক্রন্দনে বিমলার নেশা ভাঙ্গিল, সে বুঝিতে পারিল যে পশ্চাতের জীবনে ফিরিবার আর কোনও উপায় নাই। এদিকে মধুলোভী মুগ্ধ ভ্রমরদের ভীড় বাড়িয়া চলিল। ইঙ্গিতে দৃষ্টিতে কদর্য্য পিপাসা আর প্রলোভন।

ওদিকে পাপের বোঝাটি দিবারাত্র ট্যাঁ ট্যাঁ করে। বিমলা বড় মুস্কিলে পড়িল, সে কি করিবে? অবশেষে সে একদিন নিজের পাপকে ভুলিতে চাহিল। এক মত্ত মুহূর্ত্তে সে ঐ শিশুটির কোমল গলদেশ নিপীড়ন করিয়া তাহাকে এই পৃথিবী হইতে বিদায় দিল। যন্ত্রণায় বেচারীর দেহটি কয়েকবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল মাত্র' আর কিছু নয়। তারপর দূরে এক জঙ্গলে, মাটীর নীচে তাহার কচি দেহ চাপা পড়িল। হায়, বিমলা ভুল করিয়াছিল। পাপ দূর করিতে গিয়া সে তাহাকে আরও কায়েমী করিয়া তুলিল, অজ্ঞাত নিয়তির আকর্ষণে সে থামিল এই গলিতে। তাহার পর এই গলির অন্ধকারে বহু মানবের আলিঙ্গনে নিপিষ্ট হইয়া বিমলা হইল টগর। সে কবেকার—

পদশব্দ।

একজন বৃদ্ধ আসিল। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। স্থূলদেহ, শীর্ণকায়, মাথার চুলগুলি কাঁচাপাকা, ছোট ছোট চোখে সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, পরণে কোঁচান ধুতি, পাঞ্জাবী আর সিল্কের চাদর।

"আসুন"—টগর বলিল।

বারান্দা হইতে শশী একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল;

বৃদ্ধ হাসিল, "আসুন কিগো, এসেছি।"

"বসুন।"

বৃদ্ধ বলিল, "তোমার নামই টগর বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—

"বেশ বেশ, তা বাছা শশী মিথ্যে কথা বলেনি—তুমি দেখ্‌তে মন্দ নয়।

টগর হাসিল, "পান খাবেন?"

"নিশ্চয়ই, অনেক পান ত' খেলাম, তোমার হাতেরটাও খেয়ে দেখি। দেখো যেন গুন্ করো না ভাই।"

বৃদ্ধ রসিক।

টগরও রসিকতা করে, "গুণ করলেই বা ভয়ের কি, আমি কি বাঘ?"

"বাঘ! কে বলে তা? তোমরা বাঘের চেয়েও বড়—তোমরা হচ্ছ বাঘের মাসী।"

বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ দেওয়ালে বিলম্বিত কালীর পটের উপর দৃষ্টি পড়ায় তাহার হাসি থামিয়া গেল, দৃষ্টি নত হইল, ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া সে বলিল, "বাতিটা নিভিয়ে দাও ত"—

"কেন?" টগর বিস্মিত হয়, "এত তাড়াতাড়ি, গল্প করবেন না?"

"নেভাও বলছি।"

অন্ধকার।

"ঘরে মায়ের ছবি রেখেছ কেন?" বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল।

"আমরা কি মায়ের সন্তান নই?"

"না, তা বলছি না—কিন্তু মায়ের ছবির সামনে ভয় হয়।"

"তবে ফিরে যান।"

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধ টগরকে নিকটে টানিয়া লইল। লোল চর্ম্মের স্পর্শ।

"পাগল, এখানে যারা আসে, তারা কি ফিরবার জন্য আসে?"

টগর মৃদু হাসিল, "ছবি না রাখ্‌লে কি মা এসব কাণ্ড দেখ্‌তে পান না?"

"না—তা নয়—তবে"—

"কেন তবে এই ফাঁকি, পাপ করছেন আবার নিজেকে ভুলও বোঝাচ্ছেন!"

বৃদ্ধ নিবিড়ভাবে টগরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ও বাবা, তুমি যে অনেক বড় বড় কথা জান যাইরি।"

সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া শশী যেন কি ভাবিতেছে। বেশ্যার ছলে শশী।

আলো জলিল।

বৃদ্ধ ম্লান হাসিয়া বলিল, "নেশা কাটলে যেমন সব বিস্বাদ মনে য় এখন তেম্নি মনে হচ্ছে। ভাব্ছি—কেন এসেছিলাম?"

"কেন এসেছিলেন?"

"তা কি জানি—মনকে সামলাতে পারি না। ঘরেতে আমার া ছেলে-মেয়ে নাতি নাত্নী সবই ত' আছে তবু তোমাদের খানে একবার না এসে পারি না—কেন?"

"আমাদের ভালবাসার টান"—টগর হাসিয়া বলিল।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িল, "তোমাদের ভালবাসা! সে ত' মিথ্যা -অভিনয়।"

সে নীচে নামিয়া গেল।

মিথ্যা—অভিনয়! বিমলার ভালবাসা কি মিথ্যা ছিল!

রাধা তখনও একই ভাবে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। একটি লোকও াহার দিকে ফিরিয়া চাহে না।

মানদাও একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল, টগরকে দেখিয়া একগাল াসিয়া বলিল—"তোদেরই ভাগ্যি মাইরি।"

"কেন?"

"একটা যাচ্ছে ত' আরেকটা আস্ছে।"

টগর মৃদু হাসিল।

"বুঁচী, পান্না, কনক—এরা বুঝি ঘরে?"

"হ্যাঁ।"

মানদা সাগ্রহে রাস্তার দিকে তাকায়। কেহ কি মুগ্ধ হইল? কদিন কিন্তু তাহার দ্বারে লোকেরা হুমড়ি খাইয়া পড়িত। সেই

যে এক মারওয়াড়ী, কি বিরাট ভুঁড়ী ছিল তার! সে একদিন আসিয়া মানদার পা জড়াইয়া ধরিয়া কত সাধিয়াছিল তাহার সহিত যাইতে, কিন্তু সে যায় নাই। আর আজ? নিজের মুখের বসন্তের দাগগুলির উপর মানদা হাত বুলায়।

রাধার দিকে চাহিয়া টগরের মনটা কেমন যেন করে। মোলায়েম সুরে সে ডাকিল—"রাধা।"

রাধা ক্লান্তভাবে তাহার দিকে চাহিল।

"তোর টাকার দরকার তো একটা টাকা নিস্ আমার কাছ থেকে, তুই এখন ভেতরে যা ভাই।"

রাধা নিরুত্তরে মুখ ফিরাইয়া লইল।

রাত্রি বাড়িতেছে। রাত্রির কালো ধমনীতে তাহার কালো আত্মার স্পন্দন। গলির মধ্যে ভীড়। নানা মুখ আর নানা কথা, হাসি আর ইঙ্গিত, মদ আর পানের পিচ্, অদৃশ্য বীজাণুর হাসি আর কানাইয়ের দোকানের মাংসের গন্ধ। হ্যাঁ, রাত্রি বাড়িতেছে।

আবার শশী আসিল।

"আর একটাকে এনেছি"—সে বলিল।

তাহার পশ্চাতে একটি লোক টলিতেছিল। তাহার মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত, অত্যাচারে গাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রক্তাভ দৃষ্টিতে অর্থহীন চাহনি। চেহারাটা তাহার ভালই, দেখিয়া অবস্থাপন্ন ও ভদ্র বলিয়া মনে হয়।

"নিয়ে আয়"—বলিয়া টগর সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে জড়িতস্বরে লোকটি বলিল, "অত হন্‌হন্ করে যেয়োনা ভাই, মুখখানা একবার দেখাও"—

টগর থামিল, লোকটির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখুন না কত দেখ্‌বেন।"

লোকটি টলিয়া টলিয়া দেখিতে দেখিতে হাসিল, "বেশ মুখ।"

লোকটিকে টগরও দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তাহার সারা দেহের রক্তস্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিল, প্রতি কোষে উপকোষে হিংস্রতার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, দুই হাত বাড়াইয়া কঠিনভাবে লোকটির গলা টিপিয়া ধরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "শশী।"

শশীর লম্বা ছায়া সিঁড়ির ধাপে পড়িল।

"এ হারামজাদাকে বের করে দে।"

"কেন?"

"বের করে দে বলছি।"

লোকটির নেশা ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রাচীরে হেলান দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, "তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?"

টগর অদ্ভুত হাসিয়া বলিল, "চিনে দরকার নেই আর, এ গলিতে আর কোন দিন যেন তোমার মুখ না দেখা যায়।"

"তুমি কে?"

"আমি টগর—বেশ্যা—আবার কে।"

"না, ঠিক করে বল তুমি কে?"

টগর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "শশী—হতভাগা আমার কথা কি তোর কানে যায় নি...বের করে দে এ কুকুরটাকে।"

শশী লোকটির হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

তবুও লোকটি আকুলকণ্ঠে বলিল—"তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?"

শশী আবার তাহাকে ধাক্কা দিল।

টগর একটা সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িল।

দুইটি কাবুলীওয়ালাকে লইয়া রাধা উপরে চলিয়া গেল। তাহার টাকা চাই—আজই।

হঠাৎ টগর উঠিল, দ্রুতপদে দ্বারপার্শ্বে গিয়া গলির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল। লোকটি টলিতে টলিতে গলির মোড়ে অদৃশ্য হইল। সুধীর অদৃশ্য হইল। হইবে না ত' কি—টগর ত বিমলা নয়। বিমলা তাহাকে ভালবাসিত, টগরের সে শত্রু।

মানদা প্রশ্ন করিল, "ফিরিয়ে দিলি কেন রে?"

নিরুত্তরে টগর নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে কি যেন হইয়া গেল। না দুঃখ, না ক্রোধ, না হতাশা, এমনি একটা অবর্ণনীয় ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সে নিঝুমের মত পড়িয়া রহিল আর অতীতের ছবিগুলি একের পর এক ভোজবাজীর মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। কেবল একটি দূর দূরান্তরের কোন এক জঙ্গলের মাটীর বাধাকে ভেদ করিয়া একটি রুদ্ধশ্বাস কচি শিশুর কান্না ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

বাহিরে মেঘগর্জ্জন শোনা গেল।

পাশের ঘরে কাবুলীওয়ালা দুইটি তাহাদের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি সব রসিকতা করিয়া হাসিতেছে। রাধা।

শশী আসিল।

"খাবি না টগর?"

"তুই খেয়েছিস্?"

"তুই আগে খা।"

টগর উত্তর দিল না।

বারান্দায় বসিয়া শশী বলিল, "পুরানো দিনের কথা ভাবিস না, এমনি হয়, অথচ কত কথাই না ভেবেছিস এই অপদার্থ লোকটার বিষয়ে!"

"ওসব কথা ছাড় দেখি।" টগর তিক্ত হইয়া উঠিল।

শশী ম্লান হাসিল, "আচ্ছা তবে খেয়ে নে চারটি।"

টগর উঠিল। দিনের রাঁধা ভাত একটি পাত্রে কিছু দিয়া বলিল, "নে খা।"

শশী খাইতে বসিল।

পাশের ঘরে রাধা একটু গোঙাইয়া উঠিল।

টগর খাওয়া দেখে। একগাল ভাতের চাপে শশীর দক্ষিণ গালটা ক্ষণেকের জন্য মাংসল বলিয়া মনে হয়। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় সে খাইতেছে তাই আরামে তাহার চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত হইয়া আসে। টগরের মমতা বোধ হয়। শশী নাকি তাহাকে ভালবাসে! ভালবাসা!

টগর হাসিল, "কি রে এখনও আমায় ভালবাসিস?"

খাওয়া থামাইয়া শশী তাহার দিকে চাহিল, কোনও উত্তর দিল না, কেবল তাহার গরুর মত ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটিতে একটা করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। পরে একটু মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "খেয়ে নে তুই এবার।"

টগর নিজের থালা টানিয়া লইল।

বাহিরে বৃষ্টি নামিল। সঙ্গে বাতাস।

কাবুলীওয়ালা দুইটি উত্তেজিত ভাবে কি বলাবলি করিতে করিতে তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

"এক গেলাস জল দে ত' শশী।"

"দিই।"

হাত ধুইয়া শশী টগরকে জল দিল। একটি বিড়ি ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সে পরে বারান্দার উপর গড়াইয়া পড়িল।

"ওকি রে, খালি মাটীতে শুবি!"

শশী রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "শরীরটাও মাটীর তা জানিস, একদিন তা মাটীতে মিশে যাবে—বাউলের গান শুনিস্ নি?"

মাটী!

ঝঙ্কার দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে টগর বলিল "বেশী কথা বলিস না হারামজাদা —ওঠ্ বলছি! খেয়ে নিই, একটা মাদুর আর বালিস দিচ্ছি।"

"আচ্ছা।"

মানদার চীৎকার শোনা গেল—"ওরে তোরা শিগ্গীর আয়—ও বুঁচী—ও টগর, শিগ্গীর আয়—রাধা নড়ে না যে!"

"এঁ্যা!" টগর উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তুই খা না, আমি দেখে আসি"—শশী রাধার ঘরের দিকে গেল।

কি হইল রাধার? টগর আর খাইতে পারে না।

শশী ফিরিয়া আসে না।

বুঁচীর কান্না শোনা যায়, "ও ভাই রাধা—রাধা।"

টগর যন্ত্রচালিতের মত গিয়া রাধার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। মলিন শয্যার উপর রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু কাবুলীওয়ালা দুইটি অকৃতজ্ঞ নয়, তাহারা একটি টাকা তাহার মাথার নিকটে রাখিয়া গিয়াছে।

ঘরের ভিতর ভীড় জমিয়া গেল। পাশের বাড়ীর কমল, মতি প্রভৃতি আর বাড়ীউলী আসিল। অনেক জেরা, অনেক চীৎকার, জল ঢালা আর পাখার বাতাস। রাত্রি গভীর হইতেছে।

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া গিয়া টগর ভাবে। রাধার নিস্পন্দ দেহটা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেই একটা দুর্নিবার বিবমিষা পাকস্থলীতে পাক খাইয়া উঠিল। সে বমি করিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে বৃষ্টি জোরে আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রি অন্ধকার। এ গলির অন্ধকার আর তাহাদের অন্ধকার জীবনের মত।

বেশ্যার ছেলেটা মমতায় ভাঙিয়া পড়ে। টগরের মাথায় জল

ঢালিয়া তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া শশী বলিল, "এবার ঘুমো টগর —ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে? আচ্ছা—" চক্ষু মুদ্রিত করিয়া টগর আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল। বিমলা। মাটী। 'টগর তোমায় যেন চিনি —তুমি কে?' রাধার মাংসহীন দেহ আর রক্ত। টগর কি করিবে?

শশী মেঝেটা ধুইয়া বাতি মিভাইয়া বারান্দায় গিয়া শুইল।

রাত গভীর হইতে থাকে। বৃষ্টি থামে না, একটানা সুরে অবিরাম পড়িতে থাকে। কালির মতো কালো আকাশ।

হঠাৎ টগর বিছানা হইতে উঠিল, বাতিটা আবার জ্বালাইয়া শশীর নিকট গিয়া তাহার দেহে ঠেলা দিয়া বলিল, "শশী!"

শশী জাগে না, সারা দিনের ঘুম তাহার চোখে।

"ও শশী—শশী?"

"এ্যাঁ—কে?"

"আমি।"

"কে—টগর?"

"হ্যাঁ।"

"কি হল?"

"চল্।"

"কোথায়?"

"এই না আজ সন্ধ্যাবেলা বলেছিলি কোথায় নিয়ে যাবি আমায়, এই কুকুরের জীবন থেকে আমায় না তুই মুক্ত করতে চাস্?"

শশীর ঘুমভরা চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, টগরের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে কি না তাহাই সে কেবল ভাবিতে লাগিল।

"নিয়ে চল্ আমায় শশী—ও শশী—তুই না আমায় ভালবাসিস্?" টগরের কণ্ঠে ক্ষুদ্র বালিকার মত কাতরতা, সে যেন বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্তে শশীর চেহারা বদলাইয়া যায়, গরুর মত ড্যাবডো.ব ও নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটিতে মধ্যাহ্নের সূর্য্য জ্বলিয়া উঠে।

টগরের ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া সে প্রশ্ন করিল, "সত্যি বলছিস টগর—না মিথ্যে কথা ?"

দুই হাতে টগর এবার শশীকে জাঁকড়াইয়া ধরিল, ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল—"সত্যি—সত্যি, এক্ষুণি চল শশী, দেরী করলে আর হয়ত হবে না।"

টগরের কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া শশী ভারী মিষ্টি হাসিয়া বলিল—"চল্‌ তবে।"

রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি।

রাস্তায় নামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহারা দুইজনে চলিল।

"বড় বিষ্টি—না ?" টগর বলিল।

শশী মাথা নাড়িল, "হ্যাঁ—তাতে কি ?"

চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে অনুভব করিয়া টগর আবার বলিল, "রাত অনেক হয়েছে—আর বড় অন্ধকার—না শশী ?"

বেশ্যার ছেলেটা গভীর অনুরাগের সহিত টগরকে আরও নিবিড়তর সামীপ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "হোক্‌ না, ভয় কি, আমি তোকে আকাশের সূয্যি এনে দেব।"

রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি। তবু—ভয় নাই, বৃষ্টি থামিবে, লোকেরা জাগিবে, রাত্রিও শেষ হইবে, বেশ্যা টগর আর বেশ্যার ছেলে শশীর জীবন নূতন দিনের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ আলো পশ্চাতে ফেলিয়া আসা গলিতে কোনও দিন ছিল না, থাকিবেও না সেখানে ত, চিরান্ধকার রাত্রির চিরন্তন বিলাস।

অধিকার

জানকী কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

"আইগে মাইয়া—ইকা ভৈল্ হো'—

বুধন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রাত গভীর, বস্তীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, দক্ষিণের গোরস্থান হইতে এখনও তাহার পশ্চাদ্ধাবনকারী কুকুরদের ক্রুদ্ধ চীৎকার শোনা যাইতেছে। এমন সময়ে কেরোসিনের ডিবার আলোকে তাহার ভাঙ্গা পা দেখিয়া জানকী কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বুধন সান্ত্বনার সুরে বলিল, "কা ভৈল্ রে, কুছ নেহি"—

জানকী তবু থামে না। সংসারে তাহার ভাই নাই, বোন নাই, মা দু'বছর আগে মারা গেছে, বাপ তারও আগে খুন করিয়া ফাঁসী গিয়াছে, একমাত্র অবলম্বন তাহার এই স্বামী। তাহার কিছু একটা হইলে সে কি করিয়া স্থির থাকে!

বুধন জানকীর কান্না দেখে। কাঁদিলে জানকীকে মানায় ভাল। জানকীর বয়স মাত্র উনিশ, সে স্বাস্থ্যবতী। রংটা কালো; কিন্তু তাতে কি আসে যায়? গাছের সবুজ পাতা কি দেখিতে সুন্দর নয়? নারীর সৌন্দর্য্য যে রংয়ের মধ্যে নয় তা বুধন বিশ্বাস করে।

জানকী বলিল, "কেন তুই বারবার যাস্?"

বুধন হাসিল, "তাহলে খাব কিরে পাগ্‌লী?"

জানকী মাথা নাড়িল, "কোন্‌দিন সিপাহী ধরে নেবে, তারপর জেলখানায় বসে বসে পচ্‌বি"—

বুধন আবার হাসিল, "হু, কোন্ শালা ধরবে আমায়? কতবার চুরি করেছি, ধরা পড়েছি?"

"ধরা পড়িস্‌নি বটে, পড়তেও ত' পারিস্‌!"

সিপাহীদের কন্তাদের নামে একটি অশ্লীল উক্তি করিয়া বুধন বলিল, "এ জন্মে নয়, বুধন কাহার অত বুরবক নয়—হাঁ—উহুঁ হুঁ—জান্‌কী, পা'টা এবার ভারী টন্‌টন্‌ করছে"—

যন্ত্রণায় বুধন মুখ বিকৃত করিয়া অস্ফুটস্বরে গোঙাইতে লাগিল।

জান্‌কীর ঠোঁট আবার ফুলিয়া উঠিল, তাহার চোখের স্তিমিত পাতার আড়ালে শীর্ণদেহ স্বামীর যন্ত্রণাকাতর মুখচ্ছবিকে কেন্দ্র করিয়া অশ্রুর বন্যা জাগিল।

স্বামীর নিকট গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে আবার সে কাঁদিয়া বলিল, "আইগে মাইয়া—ইকা ভৈল হো, অব্‌ হম্‌ কা করি?"

বুধন্‌ এবার বিরক্তবোধ করে। যন্ত্রণায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, আর জান্‌কী কিনা কাঁদিতেছে!

"আরে মৌগী চুপ্‌ কর্‌, চেঁচিয়ে কি বস্তীকে জাগাবি?"

জান্‌কীর অভিমান হইল। সে চুপ করিল।'

"উহুঁ হুঁ—আরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, যা না কোন দাওয়াই লাগা"—

জান্‌কী ঠোঁট উল্‌টায়, "কাহে? আমি কি হাকিম নাকি?"

বুধন রসিকতা করে, "তু হাকিম্‌কা শশুড়া বা"—

জান্‌কী একটু মুচ্‌কি হাসিল। তবু তাহার অভিমান পূর্ণমাত্রায় দূর হইল না। কেন অভিমান? তাহার কোনও কারণ নাই। দিনের মধ্যে দশবার এমনি অভিমান হয়, ঝগড়া হয়, গালাগালি হয়—তাহাতে কি? তাহাদের ভালবাসার ওগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

জান্‌কী ঘরের কোণে গেল। অতি ক্ষুদ্র সংসার, সুতরাং তাহাদের আসবাবপত্রের ও কোন বালাই নাই। এক কোণে একটা উনুন, তিন চারটা বাসন, কয়েকটা শিশি আর হাঁড়ি। একটা

হাঁড়ির ভিতর হইতে দুইটি হলুদ বাহির করিয়া সে বাটিতে আরম্ভ করিল।

বুধন বিচালির বিছানার উপর কাৎ হইয়া শুইয়া যন্ত্রণা আর অবসাদের মধ্যে চক্ষু বুজিয়া ভাবে। আজ গিয়াছিল সে এক উকীলের বাড়ী। না গিয়া উপায় কি? কোথায় নাকি লড়াই হইতেছে অথচ তাহার জ্বালায় চাল-ডালের দাম বাড়িয়াছে আগুনের মত। তাহার সঞ্চয়ই বা কতটুকু। মাসখানিক আগে সহরের একজন বাঙ্গালীবাবুর বাড়ীতে চুরি করিয়া সে যাহা আনিয়াছিল, তাহাতে এক মাস কাটিয়াছে। দিন তিনেক ধরিয়া আবার অভাব দেখা দিয়াছে। অথচ তাহাকে, জান্‌কীকে বাঁচিতে হইবে। সেইজন্য আজ সে বাহির হইয়াছিল বারটার পরে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, অন্ধকার বেশ গাঢ়। গোরস্থানের পরে যে আমবাগানটা আছে তাহারই মধ্যে উকীলটার বাড়ী। তাহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের পাশে একটা আমগাছ ছিল, তাহাতে চড়িয়া সে দেওয়ালে চড়ে, তারপর উঠানে নামে। কিন্তু সে জানিত না যে উকীলের ছোট ছেলে তখনও জাগিয়া পড়িতেছে। উঠানের উপর অসতর্ক পদক্ষেপের ফলে সে পিচ্ছিল মাটির উপর আছাড় খায়। কাল পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল কি না তাই। সেই শব্দে এই ছোক্‌রা চীৎকার করিয়া সকলকে জাগায়। মুহূর্ত্তের মধ্যে একলাফে সে দেওয়ালে উঠিয়া লাফ দেয়। অন্ধকারে তাড়াহুড়ায় তাহার পা ঠিকভাবে মাটি ছুঁইতে পারে নাই, ফলে ডান পা'টা একটু ভাঙ্গিয়াছে। তারপরে উর্দ্ধশ্বাসে গোরস্থানের নরম মাটির উপর দিয়া দে ছুট—দে ছুট—! কয়েকটা কুকুর ছিল, শালারা তাহাকে তাড়া করিল—উঃ, আজ দিনটা ভারী খারাপ কাটিয়াছে।

চূণ হলুদ গরম করিয়া জান্‌কী তাহার পায়ের উপর লাগাইয়া দিল।

যন্ত্রণার উপশম বোধ করিয়া বুধন বলিল—"আঃ"—

"কম ভৈল, না হো?"

"হাঁ গে"—

হাত ধুইয়া প্রদীপ নিভাইয়া জানকী স্বামীর পাশে গিয়া শুইল। কিন্তু একটু দূরে। বুধন তাহাকে রাগ করিয়া 'মৌগী' বলিল কেন?

বুধন তাহার দেহের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, "অগে"—

কোনও উত্তর নাই।

"শুনত্ হৈ!"

"কা?"

"ইধর আ না।"

"না।"

"মাফ্ কর জান্‌কী"—

"না"—

"মান্‌জা হামার রাণী"—বুধনের স্বরে কাকুতি।

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জান্‌কী স্বামীর বুকে মাথা রাখিল।

খানিক পরে সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে আজও কিছুই পেলি না, কি হবে?"

বুধন চট করিয়া জবাব দিতে পারে না। তাইত কি করিবে সে?

"অন্য কোনও কাজ দেখ্‌না"—জান্‌কী বলিল।

"কি কাজ?"

"এই চুরি করা কি ভাল?"

"ভাল না ত জানি, কিন্তু কাজ পেলে ত?"

"কুলিগিরি কর না।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। দেখা যাক।

বুধনের পা ঠিক হইতে সপ্তাহখানিক লাগিল। রামজী সাওয়ের

দোকানে পিতলের ঘটিটা আর হাতের রূপার বালাটা বন্ধক রাখিয়া জানকী এই কয়দিন চালাইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় জানকী বাজার হইতে চাল-ডাল কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শুনত্ হো জী।"

বুধন বিড়ি টানিতে টানিতে উত্তর দিল, "কি?"

"তোর দোস্ত্ কৈলাস আমায় যা তা বলেছে।"

"কি বলেছে?"

"কি আবার? জওয়ান মেয়ে মানুষ দেখ্‌লে মরদরা যা বলে তাই।"

"তুই কি বল্লি?"

"হারামজাদাকে চুলোয় যেতে বলেছি।"

"বেশ করেছিস্।"

জানকী রান্নার সরঞ্জাম লইয়া বসিল।

বুধন বসিয়া ভাবে। জানকীর কথায় কৈলাসের উপর তাহার রাগ হইয়াছে বৈকি। কিন্তু এত' গরীবের নিত্যকার ইতিহাস্। তাই বলিয়া রোজই সে খুন খারাপি করিবে না কি? কৈলাসকে সে ধমকাইয়া দিবে—ব্যস্। কৈলাস তাহার বহুদিনের পুরাতন দোস্ত। বহুবার একসঙ্গে তাহারা চুরি করিয়াছে। একবার তাহাকে সে বাঁচাইয়াছিল। তাহার উপর সে চট্ করিয়া রাগ করিতে পারে না। আর সতীত্ব? বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়িল। দুইদিন অনাহারে থাকার পরে বাধ্য হইয়া সে এক বাবুর কাছে জানকীকে দাসীবৃত্তি করিতে পাঠাইয়াছিল। দাসীবৃত্তি মানে বেশ্যাবৃত্তি। জানকী প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল বৈকি, কিন্তু বাঁচার আগ্রহ যাদের আছে তারা সব সহ্য করে। জানকীও তাহাই করিয়াছিল।

"বুধন ভাই"—

"বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া কৈলাস দাঁড়াইয়াছে। নেশায় তাহার পা কাঁপিতেছে। হাতে একলবৃনি তাড়ি।

"ক্যা রে।"

জানকী একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বলিল "হারামজাদা এসেছে—"

বুধন বাহিরে দাওয়ার উপর বসিল।

কৈলাস বসিয়া বলিল—"তোর বৌ আমায় আজ গাল দিয়েছে রে বুধন।"

"বেশ করেছে।"

"সত্যি, তোর বৌ বড় দেখ্‌তে সুন্দর, লোভ হয়।"

বুধনের চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিয়াই আবার নিভিয়া যায়।

তাড়ির ভাঁড় দেখাইয়া তালপাতার ঢোঙ্‌টা বাড়াইয়া দিয়া কৈলাস বলিল—"লে, জী।"

পয়সা নাই তাই দিন পাঁচেক সে তাড়ি খাইতে পারে নাই। বুধন সাগ্রহে ঢোঙটা লইল।

একটু পরেই শরীরটা তাহার বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

নানা কথাবার্তার পর কৈলাস বলিল—"তোর খবর কি?"

"কিছু না।"

"নতুন কোথাও যাস্‌নি?

"না।"

"আমাদের সঙ্গে যাবি?"

"কোথায়?"

"বিহ্‌টার দিকে।"

"তোদের সঙ্গে মানে ডাকাতি করতে ত?

"হাঁ রে শালে।"

"না ভাই।" ডাকাতি করাটা বুধনের সয় না।

"তে শালে বড়া ডরফোক।"

"হুঁ"—

নানা বাজে কথা বলিয়া, রান্নাঘরের দিকে বারংবার চাহিয়া অবশেষে কৈলাস বিদায় লইল। যাওয়ার সময় শেষবারের মত রন্ধনরতা জানকীকে শুনাইয়া গাহিয়া গেল "তীর মারা রে, হাঁ—তীর মারা রে—"

কৈলাস চলিয়া গেলে বুধন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"হাসছিস কেন?" জানকী প্রশ্ন করিল।

"কৈলাসওয়া তোঁহার লাগি পাগল ভৈল হো।"

জানকী একটু মুচকিয়া হাসিল। পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টি দৃষ্টিকটু হইলেও নারীচিত্তে সাড়া জাগায় বৈকি!

হাসি থামাইয়া বুধন ভাবে। কিন্তু? ডাকাতি করা তাহার ভাল লাগে না, কিন্তু চুরিতেও ত' সুবিধা হইতেছে না।

তাহার সঙ্গীরা ত' জেলে। পিয়ারীলাল আর লছমন্ আলবৎ বাহাদুর ওরা, মার খেয়েও তার নাম করেনি। ওরা ত জেলে। একা চুরিতে সুবিধা হয় না। এই পা-ভাঙ্গা তার সাক্ষ্য। কিন্তু উপায় কি? জানকীকে দিয়া পয়সা রোজগার করান? দাসীবৃত্তি আর বেশ্যাবৃত্তি? না। সে মরদ না? অতএব? হ্যাঁ, কুলিগিরিই সে করিবে।

কয়েকদিন সে লুকাইয়া লুকাইয়া ষ্টেশনে কুলিগিরি করিল। বেশ চলিল। কিন্তু একদিন কুলিরা তাহাকে বেদম মার দিল।

বুধন কুলিগিরি ছাড়িল।

রাত্রে আবার জানকী কাঁদে, প্রহার-জর্জ্জরিত,—স্বামীর দেহে হাত বুলায়।

এবার? বুধন চক্ষু বুজিয়া ভাবে। কারও বাড়ীতে চাকরী?

বুধন তাহা মরিলেও পারিবে না। বাবুদের মত সেও কি মানুষ না? এটা কর, ওটা কর, পা টিপে দে—এই সব ফরমাস সে সহ্য করিতে পারে না। অতএব? আবার চুরি। পাপ? মানুষে মানুষে বৈষম্য যতদিন থাকিবে, ততদিন বুধন চুরি করিবেই। স্বার্থান্ধ মানুষের বৈষম্য সৃষ্টি করা যদি পাপ না হয়, তবে তাহার চুরি করাও পাপ নয়। বুধনের জীবনের এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

তিনদিন পরে একদিন দুপুর বেলা বুধন সারা কদমকুঁয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, সব বাড়ীর প্রবেশপথ পর্য্যবেক্ষণ করিল। অবশেষে বাখর-গঞ্জের গলির একটি দ্বিতল বাড়ী তাহার পছন্দ হইল। গৃহস্বামী অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হইল। বাড়ীটির পিছনদিকে একটি নল আছে, তাহা বাহিয়া অনায়াসে বারান্দায় উঠা যাইবে। বারান্দার দক্ষিণ দিকের ঘরটিই আসল ঘর। বাড়ীটির পিছনে একটি সরু গলি, তাহা গিয়া শেষ হইয়াছে সাহেবদের গোরস্থানের পিছনে। ঠিক, আজ এই বাড়ীতেই সে আসিবে।

কোতওয়ালির ঘণ্টায় যখন বারটার ঘা পড়িল তখন বুধন উঠিয়া দাঁড়াইল।

জানকী বিছানায় উঠিয়া বসিল।

"কোথায় যাচ্ছিস্?" সে প্রশ্ন করিল।

-'এম্‌নি।"

"চুরি করতে?"

"হাঁ।"

"না।" জানকী আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

"পাগ্‌লামি করিস্‌না জানকী।"

"কেন, অন্য কিছু কাজ করনা।"

"তার নতিজা ত' সেদিন দেখ্‌লি।"

"তবে চাকর হ।"

"মরে গেলেও তা পারব না।"

"তবে আমি দাসীগিরি করব।" জানকীর কণ্ঠে মিনতি।

"দাসীগিরি করতে গেলে কি করতে হয় মনে নেই তোর?"

জানকী লজ্জায় মাথা নীচু করিল, তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিল।

অন্ধকারে চলিতে চলিতে জানকীর কণ্ঠস্বর বুধনের কানে ভাসিয়া আসিল। জানকী স্বামীর জন্য ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছিল—

—"সীয়ারাম-সীয়ারাম"—

বাড়ীটির পশ্চাতে গিয়া বুধন দাঁড়াইল। পরে এদিক ওদিক চাহিল। না, গলিতে কেহ নাই। বাড়ীটির দিকে একবার চাহিল।

।টা অন্ধকার, সকলে ঘুমাইয়াছে। মুহূর্ত্তে তাহার বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা সজোরে চলিতে আরম্ভ করিল, রক্তস্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিল।

দুই হাত মুখে লাগাইয়া হঠাৎ সে কুকুরের কান্নার হুবহু নকল করিতে লাগিল। যেন ভারী দুঃখে একটি কুকুর কাঁদিতেছে।" ওস্তাদ বদরীপ্রসাদ তাহাকে ইহা শিখাইয়াছিল, গৃহস্থেরা জাগ্রত কিনা তাহা ক্ষা করিবার জন্য।

কোনও সাড়াশব্দ শোনা গেল না। না, কেহ জাগিয়া নাই।

নল বাহিয়া বুধন উপরে উঠিতে লাগিল। সকালে সেদিন বৃষ্টি হইয়াছিল, নলটা একটু পিচ্ছিল। বুধন সন্তর্পণে উঠিতে লাগিল।

এমন সময় গলির প্রান্তে একজন লোক আসিল। সে বুধনকে দেখিতে পাইয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। বুধন তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

লোকটি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "চোর হায় হো, পাকড়ো-পাকড়ো"—

একটু ভয়ও জন্মিয়া গিয়াছিল। আজকাল সে একা চুরি করিতে যায়, চট করিয়া কিছু করা উচিত নয়। কদমকুঁয়ার দিকে এখন ত' নয়ই কারণ সর্কলে সতর্ক হইয়া গিয়াছে।

সারাদিন ধরিয়া বুধন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায় আর প্রায়ই দেখে মিছিল চলিয়াছে জাতীয় পতাকা লইয়া চীৎকার করিতে করিতে। তাহা দেখিতে বেশ লাগে বুধনের। একটু ঈর্ষাও হয়। 'বন্দেমাতরম্' আর 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' সেও বলিতে পারে, যদি পেটের চিন্তাটা দূর হইত। ঐ লোকদের সকলেরই খাবার আছে তাই অমন করিয়া চেঁচাইতে পারে। কিন্তু সে চোর, তাহার সে উপায় নাই। সে অন্ধকারের জীব। কিন্তু সত্যি—এবার কি হইবে? জানকীর হাতে ত একটিও পয়সা নাই। কুলিগিরি, চাকর হওয়া পোষাইবে না—অতএব?

সেদিন অমনি কাটিল।

তাহার পরদিন বস্তীর একজন বাবুর বিছানা ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া সে দু'আনা পয়সা পাইল। তাহা দিয়া সে ছাতু কিনিয়া বাড়ী ফিরিল। তাহাতেই আজ চলিয়া যাইবে।

সেদিন কংগ্রেসীদের মিছিল আর চেঁচামেচি আরও বেশীমাত্রায় দেখা যাইতে লাগিল।

কদমকুঁয়ার মোড়ের পানের দোকানটার সামনে সে দুপুরবেলায় বসিয়াছিল। এমন সময় দেখা হইল কৈলাসের সহিত। সে বেশ বাবু সাজিয়াছে। ডাকাতী। কিন্তু বুধনের দ্বারা তাহা হইবে না।

"ক্যারে—কা খবর?" কৈলাস প্রশ্ন করিল।

"ভাল না।" বুধন বলিল।

"কেন?"

"একা সুবিধে হচ্ছে না"—

"বল্লাম আমাদের সঙ্গে চল্, দেখছিস্ আমার পোষাক—সব ওরি গুণে"—

"হুঁ—কিন্তু আমার দ্বারা ও হবে না, আমার ভয় করে।"

"দূর কায়র (কাপুরুষ) কোথাকার—লে, বিড়ি খা।"

তাহার পরদিন জানকী তাহার সখী রামবতী'র নিকট হইতে একসের চাল ধার করিয়া আনিল।

কি করিবে বুধন? তাহার লজ্জা হয়, কিন্তু নিজের যা ক্ষমতা তাহার অতিরিক্ত সে আর কিছুই করিতে পারে না। উত্তরাধিকারসূত্রে সে পিতার নিকট হইতে চুরি করিতেই শিখিয়াছে। আর কিছুই তাহার দ্বারা হইবে না।

রাত্রিবেলায় জানকী বলিল, "কৈলাস কি বল্‌ছিল জানিস?"

"কি?"

"বলছিল তোদের হালৎ এখন খারাপ; আমার কাছ থেকে টাকা নে দশ বিশ—যা লাগে"—

"আর?"

"তার বদলে মাঝে মাঝে রাতের বেলায় ওর ওখানে গিয়ে আমায় শুতে বল্ল"—

"হুঁ"—

চুপ করিয়া বসিয়া বুধন ভাবে। আজ? না, আজ চুরি করা যাইবে না। মেজাজ ভাল না। কৈলাস হারামজাদা জানকীকে লোভ দেখায়—কিন্তু জানকী সে রকম না, সে—

"জানকী"—

"কি?"

"আমি চোর, আমি গরীব, আমি তোকে ভালভাবে খাওয়াতে পারি না, তবু তুই কি আমায় পিয়ার করিস্ ?"

নিরুত্তরে জান্‌কী কাহারণী বুধনের উপর উন্মত্তার মত লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিল। ভালবাসা ? হাঁ, সে ভালবাসে তাহার স্বামীকে।

পরদিন জান্‌কী কলাইকরা লোহার থালাটা বন্ধক রাখিল।

বুধন আজ কোথাও চুরি করিবেই স্থির করিল।

দুপুরবেলায় সেই উদ্দেশ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গোলঘরের দিকে গেল। সেখানে গিয়া সে দেখিল যে বিরাট জনতা চলিয়াছে সেক্রেটারিয়েটের দিকে। পুলিশ তাহাদের বাধা দিতে চলিয়াছে কিন্তু বিরাট, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর উত্তেজিত জনতাকে তাহারা আটকাইতে পারিল না।

সেই কোলাহল, লোকদের সেই উত্তেজিত দৃষ্টি বুধনকে ভাবাইয়া তুলিল। লোকগুলি কি চায় ? স্বরাজ। স্বরাজ পাইলে লোকদের দুঃখ দূর হইবে, এমন কি বুধনকেও চুরি করিতে হইবে না। বর্ত্তমানের এই সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইবে, বুধনের আর চুরি করিবার দরকার পড়িবে না। বুধনও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। হাঁ, স্বরাজ চাই। সেও সেই জনতায় মিশিয়া গেল।

রাত্রে স্বপ্নাবিষ্টের মত বাড়ী ফিরিয়া সেক্রেটারিয়েট প্রাঙ্গণে জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া সে জানকীকে বলিল—"উঃ, জান্‌কী, কত খুন পড়েছে—"

"খুন !"—জান্‌কী চমকিয়া উঠে।

"হাঁ—উঃ—কত লোকের খুন আজ দেখ্‌লাম, হোরী খেলার খুনখারাবি রংয়ের মত লাল খুন"—

"তুইও গিয়েছিলি, সিকিটারিটে ?"—

"হাঁ"—

"আইগে মাইয়া, তোঁহার দিমাগ খারাপ ভৈল্ কা ?"

পরদিন।

বাড়ীতে চাল নাই, ডাল নাই, জীবনধারণের কোনও উপকরণ নাই। জান্‌কী কি করে, কার কাছে ভিক্ষা করে, তাহা বুধন দেখে না। সহরের আন্দোলন তাহার চিন্তাকে বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, সেক্রেটারিয়েটে নিহত দেশভক্তদের রক্তস্রোত অহরহ তাহার মাথায় ঘুরিয়া বেড়ায়। হাঁ্যা, স্বরাজ চাই, তাহা না হইলে এই অচলায়তন সমাজের শিকড় নড়িবে না, তাহার চুরি করা শেষ হইবে না। মানুষ হিসাবে তাহার কতকগুলি অধিকার আছে। সকলের মত বাঁচিয়া থাকা তাহাদের মধ্যে একটি।

সেদিনও সে সারাদিন উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিত সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল, টেলিগ্রাফের লাইন কাটিল, রাস্তা খুঁড়িল, গাছ কাটিল, সাহেব-বেশধারী লোকদের অপমান করিল। দিনের বেলায় সে আর বাড়ী ফিরিল না। একজন মাড়োয়ারী তাহাদের কয়েকজনকে খাওয়াইল।

বাড়ী ফিরিল সে অনেক রাত্রে।

জান্‌কী তখনও অভুক্তা ছিল।

পরদিন সকালবেলায় জান্‌কী বলিল, "কিছুই যে নেই"—

বুধনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, "তাই নাকি ?"

"হাঁ্যা"—

"আচ্ছা—আজ চুরি করব।"

"কেন খালি চুরি করবি; অন্ন কাজ দেখ্ না।"

বুধন মাথা নাড়িল, "না, চুরি করাই আমার অধিকার জান্‌কী।"

জান্‌কী অতি কষ্টে ভিক্ষা করিয়া দিনেরবেলার খাদ্য সংগ্রহ করিল।

দুপুরবেলায় সেদিন গোরা সৈন্যেরা আসিয়া পথ বন্ধ করিল। যাহাদের নিকট পাস আছে, তাহারা ছাড়া আর কেহ পথ দিয়া যাইতে পারিবে না। বস্তীর শেষে, কদমকুঁয়ার মোড়ে তাহারা একদল আড্ডা গাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ অর্ডার জারী হইল যে সন্ধ্যা সাতটার পর কেহ পথে বাহির হইতে পারিবে না।

মোড়ের মাথায় বসিয়া বসিয়া বুধন গোরা সৈন্যদের দেখিল, ঝক্‌ঝকে বেয়োনেট লাগানো বন্দুক হাতে, সিগারেট মুখে তাহারা তাহাদের ভারী বুটের শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া তুলিয়াছে, তাহাদের পিঙ্গল চোখে অবরুদ্ধ ক্রোধ।

বুধনের বড় মুস্কিল হইল। বাড়ীতে কিছু চাই, অথচ চুরি না করিলেও চলিবে না। কিন্তু কেমন করিয়া চুরি করে সে? শুধু এই এক জায়গায় নয়, সহরের সর্ব্বত্র, এমনকি রেললাইনে পর্য্যন্ত কড়া পাহারা রাখা হইয়াছে, তাহা ছাড়া গোরা সৈন্যেরা নাকি রাস্তায় রাস্তায় টহলও দিবে। সাতটার পর কাহাকেও দেখিলে তাহারা নাকি গুলি করিবে। সেক্রেটারিয়েটের রক্তাক্ত-স্মৃতি।

রাত্রিবেলায় কিছুই ছিল না। জান্‌কী আর বুধন দুইজনেই অনাহারে রহিল।

মধ্যরাত্রে বুধন উঠিয়া দাঁড়াইল।

জান্‌কী ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আজ আবার কোথায়?"

"না খেয়ে আছি মনে নেই?"

"তাতে কি?"

"যাই, দেখি কিছু আনতে পারি কিনা"—

"থাক্—কিছুর দরকার নেই।" জান্‌কী তাহার হাত ধরিল।

"বাঃ, না খেয়ে ক'দিন থাকবি ?"

"যে ক'দিন পারি"—

"পাগল"—

"দোহাই তোর, গোরাদের গুলিতে জান্ দিবি ?"

"দূর—লুকিয়ে পাড়ার ভিতরেই যাব"—জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বুধন বাহির হইয়া গেল।

চুপি চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া সে রাস্তার পিছনকার জলার ধার দিয়া গিয়া সাহেবদের গোরস্থানের দিকে গেল। আর বিশ হাত দূরেই গোরাদের ঘাঁটি। কিন্তু উপায় কি ? বস্তীতে কাহার ওখানে সে চুরী করিবে ? সবাই গরীব, আর সবাই সন্দেহ করে যে বুধন চোর। বরঞ্চ রামজী সাওয়ের দোকানে আজ সে যাইবে। সুতরাং এই রাস্তা তাহাকে পার হইতেই হইবে।

রাস্তার অপর পার্শ্বে গোরস্থান। রাস্তাটা পার হইয়া গোরস্থানে পৌঁছাইলেই হইল। বালেশ্বরের আস্তাবলের আড়াল হইতে সে একবার রাস্তার দুই পার্শ্বে উঁকি মারিল। না কেহ নাই। দূরে গোরারা দাঁড়াইয়া আছে।

হামাগুড়ি দিয়া সে রাস্তার উপর অগ্রসর হইল। হঠাৎ একটি টর্চের আলো তাহার অনতিদূরে পড়িল। সে ধরা পড়িয়াছে।

বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া আবার সে জলার দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

পরমুহূর্ত্তে রাইফেলের গর্জ্জন ধ্বনিতে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা কাঁপিয়া উঠিল।

বুধন থামিল একেবারে বাড়ী গিয়া

বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া জানকি কাঁদিতেছিল আকুল হইয়া। রাইফেলের শব্দ সে শুনিয়াছিল।

জান্‌কীর পাশে শুইয়া পড়িয়া বুধন চোখ বুজিল। জান্‌কীর কান্না থামিল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই বুধন দেখিতে পাইল যে সিপাহী আর গোরারা মিলিয়া রাস্তার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ধরিয়া রাস্তা পরিষ্কার করাইতেছে, অনেকে মারও খাইতেছে। ভয়ে বুধন আর বাহির হইল না।

কিন্তু না বাহির হইলে চলে কি করিয়া? ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। জান্‌কীর অবস্থাও ত' একই, কিন্তু সে ত' মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিবে না।

বুধন বাহির হইল।

বস্তীর ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে সে চন্দর কামারের ওখানে গিয়া হাজির হইল। অনেক চোরাই বাসন সে চন্দরের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে।

"কি খবর বুধন ভাই?"

"এম্‌নি দেখাশোনা করতে এলাম ভাই।"

"বোস, বোস—তারপর কি হালচাল?"

"হালচাল ত' খারাপ ভাই"—

"হুঁ, তা ত' দেখ্‌তেই পাচ্ছি, এবার ত' খালি মার-কাট্‌, দাঙ্গা আর লড়াই হবে"—

"হুঁ"—

"তারপর? কিছু মাল আছে নাকি?" চন্দর ইসারা করিল।

"না ভাই"—

"তবে?"

"তোমার কাছে একটু দরকার ছিল ভাই।"

"কি ?"

"আমাকে চার আনা পয়সা উধার দেবে ?"

"রামরাম ভাইয়া, এমন মহংগা বাজারে পয়সা কি আর হাতে থাকে ?"

"বড় দরকার ভাই"—

"ভগবানের কসম-ভাই, নেই।"

বুধন উঠিয়া দাঁড়াইল।

সারাদিন দুইটি প্রাণীর অনাহারে কাটিয়া গেল। কাহারও নিকট হইতে কিছু পাওয়া গেল না।

কিন্তু মাথার উপরকার অনন্ত নীল সমুদ্র, পাখী, মানুষের কোলাহল, জনতার মিছিল, জান্‌কী, নিজের হৃদপিণ্ডের অন্তরালস্থিত প্রাণের স্পন্দন আর ক্ষুধার্ত্ত জঠর সকলেই জানায়—বাঁচ—যেমন ভাবেই হোক্।

অতএব ?

সন্ধ্যাবেলায় নতমস্তকে বুধন ডাকিল, "জান্‌কী"—

"কি ?"

"শোন্"—

ঘর অন্ধকার। ডিবায় তেল নাই। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহাদের দুইজনের ক্ষুধাকাতর ক্ষীণকণ্ঠ দম্‌কা বাতাসের সঙ্গে উত্থিত তৃণের বিলাপের মত শোনায়।

"কি বল্ না।" জান্‌কী বলিল।

"ক্ষিদেয় তোর ভারী কষ্ট হচ্ছে, না ?"

"না"—

"মিথ্যে কথা বলিস না"—

জান্‌কী জবাব দিল না।

"আমারও ভারী কষ্ট হচ্ছে"—বুধন বলিল।

অন্ধকারে অদৃশ্য দুটি কালো হাত বুধনের গলা জড়াইয়া ধরে।

"একটা কথা বল্‌ব জান্‌কী ?"

"বল্‌"—

"জিন্দ্‌গী বড় পিয়ারা—সুতরাং ইজ্জতে কি হবে ?"

জান্‌কীর শরীরটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

বুধন বলিয়া চলিল,—"একবার ইজ্জত বেচে আমরা বেঁচেছিলাম জান্‌কী, আজও তাই কর্‌।"

দৃঢ় বাহুবেষ্টনে বুধনকে নিষ্পেষিত করিয়া জান্‌কী কাঁদিয়া বলিল —"না"

"তাতে কি জান্‌কী, বদন্ একবার অপবিত্র হলেই বা, তোর মন ত' আমার, তুই ত' আমাকেই ভালবাসিস। একবার খেলেই আমার চুরি করার মত গায়ে তাকত্ হবে, তখন আর এ অপমান তোকে সইতে হবে না।"

"না।"—জান্‌কী আবার কাঁদিল।

"না! আচ্ছা তবে থাক্‌, না গেলি।" অস্ফুট কণ্ঠে বুধন বলিল।

মৃতের মত বুধন বসিয়া রহিল। বুকের উপর তাহার নরম দেহ এলাইয়া দিয়া জান্‌কী কাঁদিতেছে।

খানিকক্ষণ কাটিল।

ঘরের ভিতর একটা গুমোট ভাব।

জান্‌কী উঠিল।

"কোথায় যাস ?" বুধন অতিকষ্টে প্রশ্ন করিল, তাহার মাথা ঝিম্‌-ঝিম্ করিতেছে।

"কৈলাসের ওখানে"—

দগ্ধ লোহার মত জ্বালাময় জান্‌কীর ঐ কথাগুলি।

"কোথাও বেরোস্ না তুই"—জান্‌কী বলিল।

"না।"

"ঠিক?"

"হুঁ"—

অন্ধকারে জান্‌কীর লঘু পদশব্দ মিলাইয়া গেল।

লজ্জায়, ঘৃণায়, ধিক্কারে বুধন শয্যায় মুখ লুকাইল। শয়তানের মত সে কেমন করিয়া নিজের স্ত্রীকে উত্তেজিত করিল। কি দরকার এই জীবনে, যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে হয়, স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তির দিকে ঠেলিয়া দিতে হয়? কেন আমাদের জীবন এমন? পরাধীনতা?

হঠাৎ তাহার সমস্ত শিরায় শিরায় ক্রোধান্ধ অনলস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সমাজ-ব্যবস্থায় কেন এই বৈষম্য? কোন্ পাপাচারের পাপের ফলে তাহাকে চুরি করিতে হয়?

সে আজই চুরি করিবে। ঘর হইতে সেও বাহির হইল। ক্ষণ-কালের জন্য জান্‌কীর কথা সে বিস্মৃত হইল। অন্ধকারে তাহার কালো চোখের তারায় কালো আগুনের শিখা কেবল দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চুরি করিবে সে। হ্যাঁ, চুরি করার অধিকার আছে। একজনের পাপের ফলে আর একজন পাপ করে। উপায় নাই।

ধীরেপদে সে বস্তির রাস্তা বাহিয়া কদমকুঁয়ার রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল। কেন তাহাকে চুরি করিতে হয়? বুধন ভাবে। উত্তরে কতকগুলি অস্পষ্ট, আবছায়া, নানা জটে জটিল কথা তাহার মাথায় ঘোরে। তাহার শিক্ষা, তাহার সংস্কৃতি কিছুই নাই। তাই সে সেগুলি বিশ্লেষণ করিতে পারিল না। কেবল এইটুকুই হঠাৎ তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্কের কোষ বাহিয়া মনের উপর ছাপ দিল যে,

পরাধীনতাই ইহার জন্ম দায়ী। এবার দেশ স্বাধীন হইলে প্রাচীনকালের মত হইবে না। এবারের স্বাধীনতায় আসিবে চাষা মজুরের রাজত্ব। হ্যাঁ, যতদিন তাহা না আসে, চুরি করাই বুধনের একমাত্র বাঁচিবার উপায়। ' ইহা তাহার অধিকার।

ক্লান্ত অথচ হিংস্র শ্বাপদের মত সে আগাইয়া চলিল। দূরে রাজপথ দেখা গেল। গোরা সৈন্যেরা সেখানে পাহারা দিতেছে। তাহাকে আট্‌কাইবে? কে তাহারা? তাহার নিজের দেশে স্বচ্ছন্দমত সে ঘুরিয়া বেড়াইবে, নিজের জীবিকা আহরণ করিবে—তাহা যেভাবেই হোক্। কেন তাহাকে পরদেশীরা বাধা দিবে? আইন? কেন মানব আমরা অন্য জাতের আইন? গুলি করবে? দেখা যাক্।

চলিতে চলিতে এবার জানকীর কথা তাহার মনে পড়িল। তাহার শীর্ণ দেহ মুহূর্ত্তে অসুরের জ্বালাতে খাড়া হইয়া উঠিল। কৈলাসের কামাতুর মুখচ্ছবি, তাহার আলিঙ্গনে আবদ্ধা অসহায়া ও ক্ষুধাতুরা জানকী'র নগ্নদেহ তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

ক্রোধে, অবরুদ্ধ একটা ক্রন্দনের বেগ চাপিতে চাপিতে সে রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল। প্রায় ছুটিতে ছুটিতে। নারীর নারীত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতার অভাবে এম্‌নি ভাবেই চিরদিন নির্য্যাতিত হইবে। কে তাহাকে বাধা দিবে? সে আর মৃত্যুকে ভয় করে না।

রাজপথে গিয়া সে দাঁড়াইল। চুরি করিতে হইলে তাহাকে ঘাঁটি পার হইয়া পূবদিকে যাইতেই হইবে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য হইতে বজ্রকণ্ঠের হুমকি আসিল "ঠাহ্‌রো" —বিদেশী ভাষায় আরও কত কি যেন তাহার সহিত ভাসিয়া আসিল।

দূরে, অন্ধকারের প্রচ্ছদপটে রাইফেলধারী গোরা সৈন্য দুইটির চেহারা দেখিয়া বুধনের মস্তিষ্কের ভিতর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ

ঘটিল। স্বাধীনতা চাই। কে আমার অধিকার হইতে আমায় বঞ্চিত করিবে!

হঠাৎ কি ভাবিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বন্দেমাতরম্"—

প্রত্যুত্তরে দুইটি রাইফেলের গুলি অন্ধকারের বুকে শিষ্ দিতে দিতে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া বুধনের বুকে আসিয়া লাগিল।

একটি ক্ষীণ আর্ত্তনাদ। তারপরে নিজের রক্তের শয্যার উপর আসন্ন মৃত্যুর দ্রুত পদধ্বনি শ্রবণ করা।

টুক্‌রা টুক্‌রা কতকগুলি ছবি শেষবারের মত মনে পড়ে। সেক্রেটারিয়েট, খুন্‌খরাবী রংয়ের মত লাল রক্ত, জান্‌কী, কৈলাস। হ্যাঁ, জান্‌কী বাঁচিবে। দিনের পর দিন তাহার নরম দেহের বিনিময়ে, সতীত্বের বিনিময়ে সে অর্থ পাইবে, খাদ্য পাইবে, বাঁচিবে। আঃ, রক্তের মধ্যে কেমন যেন একটা নোন্‌তা স্বাদ—

বুট জুতার ঠেলা লাগিল বুধনের মুখে।

"Stone dead"—একজন সৈনিক বলিল।

"Yah"—আর একজন উত্তর দিল।

প্রথম সৈনিকটি থুথু ফেলিয়া একটি সিগারেট ধরাইল।

পলাতক

চন্দ্রালোকিত নির্জ্জন প্রান্তরের ভেতর দিয়ে তারাপদ চলছে। দক্ষিণ দিক থেকে একটা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত বয়ে চলেছে শূন্ত দিয়ে, তারাপদ'র গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগে। আঃ! তার ঘুমোতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। চারিদিকের নির্জ্জন মাঠে ধানের আর পাটের নবীন চারাগুলো ঝিমোচ্ছে, আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদের উচ্ছ্বসিত যৌবনের শোভা, বাতাসে দক্ষিণ সমুদ্রের অস্পষ্ট সঙ্গীত, রাতের পৃথিবীর তন্দ্রাবিজড়িত প্রশান্তি—এর মাঝখান দিয়ে চলতে কারুর ইচ্ছে করে না বটে, ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উপায় নেই, ঘুমোলে চলবে না—। রাত শেষ হবার আগেই তাকে বুড়ীগঙ্গা পার হতে হবে, নইলে—

তারাপদ চমকে উঠল। খুনী আসামীর মত সন্ত্রস্ত, চকিত তার দৃষ্টি। 'কেউ কোথাও নেইত? না। তবু বিশ্বাস নেই, কিছুই তারাপদ বিশ্বাস করে না। ব্রহ্মদেশে সে দেখেছে—এমনি নির্জ্জন, পরিত্যক্ত প্রান্তরে, ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে হঠাৎ লৌহশিরস্ত্রাণ ঝক্‌ঝক্ করে উঠেছে, রাইফেল আর মেসিনগানের অগ্ন্যুদ্গারের শব্দে পায়ের নীচের মাটী পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছে। কেউ কোথাও নেইত?

যদি কেউ দেখে, যদি কেউ বুঝতে পারে যে সে পলাতক, তবে—? জুনওয়ার সিং, লতিফ, হীরা, মুকুন্দ—তাদের কথা তার মনে পড়ল। তারাও পালিয়েছিল। দিন দশেক পরে দেখা গেল তারা ধরা পড়েছে। তারপরে একেবারে ফ্রণ্টে।

লিবিয়ার কথাও মনে পড়ল। মাসখানেক সে যখন ইতালীয়দের শিবিরে ছিল, তার মধ্যে সে তিন চার বার দেখেছে যে ভোরবেলায় মরুভূমির চক্রবালে সূর্য্য উঁকি মারবার আগে কুড়ি পঁচিশটা রাইফেলের গুলির আঘাতে কয়েকজন ইতালীয় বালুর ওপর লুটিয়ে পড়েছে। সে তার সঙ্গী লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞেস করাতে উত্তরে শুনেছিল যে, ওরা পলাতক। তারাপদ শিউরে ওঠে। সে ধরা পড়লেও কি এমনি শাস্তি পাবে? পাগল! তারাপদ নিজের মনে হাসল। বৃটিশ সরকার অত নিষ্ঠুর নয়। আর হীরা, কুনওয়ার, এদের ত' এরকম কিছুই হয় নি। তাছাড়া জেলও ত' হতে পারে, সে তিনবছর কাজ করেছে—একথা ভেবে দেখবার মত। দোহাই ভগবান জেলই যেন তার হয়···। কেন? কুনওয়ার, হীরা, লতিফ আর মুকুন্দ—ফ্রন্ট থেকে এরা ফিরে আসল না কেন?, কি হল তাদের? বিশ্রামের সময় ওদের ভাঁড়ামিতে, অশ্লীল ইয়ার্কিতে, দুঃসাহসিক নৈশ অভিযানে সমস্ত সৈনিকদলের মধ্যে ওরা আনন্দের পরিবেশন করত। কিন্তু কোথায় তারা? কোন গাছের আড়ালে, পাহাড়ের খাদে, নদীর গর্ভে ওরা চির-বিশ্রাম করছে···?

তারাপদ চলতে লাগল। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে, চোখে তন্দ্রার ঢেউ। তবু চলতে হবে। ভোর হবার আগেই ঢাকা পার হতে হবে, বুড়ীগঙ্গা পার হতে হবে। তারপর সে চলবে পশ্চিম দিকে—ক্ষেতের বুকের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা ধরে, বাঁশঝোপ আর বেতের বনের পাশ দিয়ে, নিশানপুর পার হয়ে, তেতুলঝোরা পার হয়ে, বুড়ীগঙ্গার খালটা সে পেরোবে—তারপরে ধলেশ্বরীর ধারে সে পৌঁছোবে। কলাতিয়া। সেখানে ভাঙ্গা ঘরের কোণে একটি উষ্ণ বুকের কোমলতায় তার বিশ্রাম লাভ হবে, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার উত্তপ্ত নয়নাশ্রু আশীর্ব্বাদ হয়ে পড়বে তার মাথার উপর··।

আঃ—পা চালাও তারাপদ—পা চালাও। রাইট্, লেফ্ট, কুইক্ মার্চ—

গুরু-গুরু-গুরু সারা আকাশ আর পৃথিবী হঠাৎ কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে তারাপদ মাটীর উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আজ যদি থাকত কুনওয়ার, হীরা, মুকুন্দ আর লতিফ তার সঙ্গে—তবে তারা হেসে উঠত হো হো করে তার কাণ্ড দেখে। কুনওয়ার নিশ্চয়ই বলত "আরে তারা, তু শালা অওরৎ আছে—"

তারাপদ পরমুহূর্ত্তেই লজ্জিত হয়ে উঠে পড়ল। ছিঃ—কোথায় বোমাবর্ষণ? আকাশের কোণে গাঢ় কালির মত মেঘ দেখা দিয়েছে, এ তারি গর্জ্জন।

কিন্তু লজ্জার কি আছে? সংস্কারের মত রক্তের মধ্যে এ বিষয়েও একটা সচেতনতা জন্মে গিয়েছে। তব্রুক ছেড়ে পশ্চাদপসরণের কথা মনে পড়ে। সেই সকাল থেকেই চলা হচ্ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে পায়ের নীচে সাহারা মরুভূমি অগ্নিস্তূপের মত হয়ে উঠছে, অগ্নিপিণ্ডের মত আকাশের সূর্য্যটা যেন ক্রমেই তাদের মাথার ওপর এগিয়ে আসছে আর দূরের বালিয়াড়ীগুলো অস্থিস্তূপের মত ভয়ঙ্কর শুভ্র হয়ে উঠছে। তারি মাঝে হঠাৎ শোনা যায় বিমানের শব্দ—আর অমনি শুয়ে পড়া মরুসমুদ্রের সুবিশাল নগ্নবক্ষের উপর, নিজেদের বক্ষতলে লুক্কায়িত জীবনের জন্য। অতএব লজ্জা কি?

ধীরে ধীরে মেঘের আড়ালে চাঁদ ডুবে গেল, ঘনীভূত অন্ধকারে দক্ষিণের বাতাস থামল—উঠল ঝড়। তারাপদ জোরে জোরে পা ফেলতে লাগল।

একটা গাঁয়ে এবার সে পৌঁছুল। সবাই সুপ্ত মনে হচ্ছে। রাত এখন কটা? বড় জোর এগারটা কিম্বা বারটা। হয়ত তারও বেশী। সময়ের গণ্ডীকে সে অতিক্রম করেছে, ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী তার জীবন

এ তিনবছর কাটেনি। কেন সে পালিয়েছে? এ কথা হয়ত সবাই জানতে চাইবে। কেন? থাক সে কথা—

জোরে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে প্রবল বাতাস। তারাপদ ভিজে গেল। গায়ে তার একটা গেঞ্জী, পরণে একটা ছেঁড়া কাপড়। তার সমস্ত পোষাক সে ফেলে এসেছে ধরা পড়বার ভয়ে।

তারাপদ আর চলতে পারে না। বহুদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সে কাটিয়েছে —বহু মানুষের ভয়াবহ ও বিচিত্র মৃত্যু সে দেখেছে, দিনের পর দিন ছিন্ন ভিন্ন শবদেহ আর বারুদের ধোঁয়ার আড়ালে সে তিলে তিলে নিজের সাহস হারিয়েছে, তাই আজ প্রকৃতির এই দুর্য্যোগময়ী রূপে সে ভয় পায়, একাকীত্ব বোধ করে। অথচ প্রকৃতি মানুষের চেয়ে নির্ম্মম নয়, তা সে জানে। থামতে হবে।

একটি বাড়ীর দাওয়ায় গিয়ে সে দাঁড়াল।

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর সে ডাকল—"কেউ জেগে আছেন?—"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। বৃষ্টির শব্দ আর মেঘগর্জ্জন আর বাতাসের একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ।

আবার সে ডাকল—"কেউ জেগে আছেন মশাই?"

এবার উত্তর শোনা গেল—"কে?" কণ্ঠস্বরে জড়তা আর বিরক্তি।

ভিতরে একটা নড়বড়ে তক্তাপোষের শব্দ। খড়মের আওয়াজ। তারপরে দরজা খুলল।

একজন বয়স্ক ব্রাহ্মণ। হারিকেনের আলোতে সে দেখলো তারাপদকে। উস্কো খুস্কো চুল, লম্বা, রোগা চেহারা, ক্ষুধিত ও ক্লান্ত দৃষ্টি।

"কে তুমি?" ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করল।

তারাপদ উত্তর দেওয়ার আগেই ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল—

"কে না কে—রাতদুপুরে তার কথার সাড়া দেওয়া আর তাকে অত কথা জিজ্ঞেস করার দরকার কি বাপু?"

ব্রাহ্মণ সে উক্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার প্রশ্ন করল, "কি বাবা, কি চাই?"

তারাপদ বাইরের দিকে তাকাল। অন্ধকার, বৃষ্টি, বাতাস আর বিদ্যুৎ। লিবিয়ার মরুভূমি আর ব্রহ্মদেশের পার্ব্বত্য অরণ্য থেকে প্রেতাত্মারা এসে যেন বাইরের ঐ প্রান্তরে অপেক্ষা করছে।

অস্বাভাবিক স্থৈর্য্যের সঙ্গে ধীরকণ্ঠে তারাপদ বলল—"আমি একজন পলাতক সৈনিক, আজকে কিছুক্ষণের জন্য আমায় আশ্রয় দেবেন—বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত?—"

ব্রাহ্মণ কথা খুঁজে পায় না।

তারাপদ নিজের গলা শুনতে পায়—"আমি পালিয়ে এসেছি, মানুষের মৃত্যু-তাণ্ডব সহ্য করতে না পেরে আমি পালিয়ে এসেছি। পেছনে আমার ওয়ারেণ্ট আছে, হয়ত জানলে আপনাদের পুলিশ জ্বালাতন করতে পারে—তবু আমায় আজ কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় দেবেন?"

নারীকণ্ঠ আবার গর্জ্জে উঠল—"বেরিয়ে যাও বাপু—আমরা নিরীহ প্রাণী—ও সব হাঙ্গামায় নেই—"

তারাপদর চোখে মৃত সৈনিকের মত দৃষ্টি।

ব্রাহ্মণের কণ্ঠ এবার ধ্বনিত হল—"আঃ—চুপ কর শুভীর মা—তোমার কি জ্ঞানগম্যি নেই। শোন বাবা, তুমি আজ যতক্ষণ ইচ্ছে থাকতে পার এখানে—এস—ভেতরে এসে বোস—"

তারাপদ ভিতরে গিয়ে বসল।

"কিছু খাবে?"—ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করল।

তারাপদ লজ্জাবোধ করে। কোথায় ছিল তার এ লজ্জা যুদ্ধক্ষেত্রে?

বন্দী অবস্থায় ইতালীয় শিবিরে সে একদিন রামলালকে ঘুসী মেরে অজ্ঞান করে তার খাবার কেড়ে নিয়েছিল। ইতালীয়রা তাদের পর্য্যাপ্ত খাবার দিত না, আর আজ?—

"না—থাক্—" সে মাথা নাড়ল।

"সেকি—! মনে হচ্ছে—তুমি অনেকক্ষণ কিছু খাওনি। না না, কিছু খাও। ওমা শোভা—নিয়ে আয় ত কিছু—"

ভিতরে শুভীর মা'র অস্পষ্ট কণ্ঠে বিরক্তি।

কিছুক্ষণ পরে একটি যুবতী মেয়ে থালায় কিছু মুড়ি, মোয়া আর দুধ নিয়ে এল। মেয়েটি ভারী সুন্দরী। চাঁপা ফুলের মত গায়ের রঙ।

তারাপদ খেল গোগ্রাসে। সারাদেহে তার কিছুক্ষণের মধ্যে পরিতৃপ্তির চেতনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। এই দেহ বিচিত্র। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র! বোমা ফাটল—এই বিচিত্র 'দেহ সে আঘাতে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল—তারপর যখন আবার মাটীতে পড়ল তখন হয়ত তাতে একটা হাত নেই, দু'টো পা নেই—কেবল সাদা আর রক্তাভ একটা মাংসপিণ্ড।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ তারাপদর মুখে যুদ্ধক্ষেত্রের কথা শুনল। তারাপদ তাকে বলল সে কেমন করে পালিয়েছে। দিনের বেলা শত্রুর খোঁজে মার্চ্চ করতে করতে সে পেছিয়ে পড়ে। তার পরে দৌড় আর দৌড়। ইরাবতীর ঘোলা জলের মধ্যে সেগুন কাঠের ভেলার ওপর বাঁশের ছোট ঘর; সেখানে একটি সহৃদয় লোকের সহায়তায় থান-বোঝাই মহাজনী নৌকায় আশ্রয়লাভ। প্রোম। সেখান থেকে আবার পায়ে হাঁটা। আরাকান-ইয়োমা পাহাড় পার হয়ে আকিয়াব। কুলাদান নদীর তীর ধরে অনাহারে অনিদ্রায় হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল পথ দিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছান। সেখান থেকে চাঁদপুর—পদ্মা—নারায়ণগঞ্জ, তারপরে আবার পায়ে হাঁটা।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ বলল—"আচ্ছা বাবা—তুমি এবার শোও—ভোর বেলায় আমি তোমায় ডেকে দেব।"

ব্রাহ্মণ চ'লে গেল।

তারাপদ একা একা বসে অন্ধকারে ভাবে। যুদ্ধের লোমহর্ষণতার কথা। দিনের পর দিন কি করে তার কোমল মন নিষ্ঠুর, হিংস্র আর বিবেকহীন হয়ে উঠেছিল তার কথা। যুদ্ধের সময় যখন সে শত্রুর বুকে অন্ধের মত নিষ্কম্প হস্তে বেয়োনেট বিদ্ধ করেছে সেই সময়কার অবর্ণনীয় যন্ত্রণাকর অনুভূতির কথা তার মনে পড়ল। সেই দিনটি! মাথার ওপর ইতালীয় বোমারু বিমানগুলো অতিকায় ক্রুদ্ধ চিলের মত গর্জ্জন করে ঘুরপাক খাচ্ছে, বোমা ফাটছে, মেসিনগানের গুলী ঝাঁকে ঝাঁকে ছিটকে পড়ছে বালুর ওপর, ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে উঠছে আর সঙ্গী সৈনিকেরা একের পর এক আর্ত্তনাদ করে পড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে জোসেফ লাফিয়ে বেরিয়ে গেল টমিগানটা ফেলে। নিজের মাথার শিরস্ত্রাণটা খুলে সে পাগলের মতো চীৎকার করতে করতে এগোতে লাগল।

সকলে উৎকণ্ঠায় চীৎকার করে ডাকল—"জোসেফ, জোসেফ—এই পাগলা কুকুর ফিরে আয়, ফিরে আয়—"

কিন্তু জোসেফ সে ডাক শোনেনি। তার কান বোমার আওয়াজে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

সে চীৎকার করে এগোতে লাগল—"কমরেডগণ—দোহাই ঈশ্বরের—থামাও এ খেলা, তোমরা কি ক্লান্তিবোধ করছ না? থামাও এ সব—এ পৃথিবী সকলের জন্য—কেন তবে এই রেষারেষি? আর যদি না থাম বেজন্মারা, তবে যিশুর রক্তের দিব্যি—আমায় মার—"

যিশুর রক্তের দিব্যি ইতালীয়রা সহ্য করতে পারল না—তারা স্থির লক্ষ্যে জোসেফকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। অনেকগুলো ছিদ্রপথ দিয়ে

বাতাস বেরিয়ে গেলে যেমন বেলুনটা কুঁকড়ে যায়—তেমনি ভাবে কুঁকড়ে জোসেফ মারা গেল। জোসেফ একজন স্কট্ দেশীয় শ্রমিক ছিল। সে পৃথিবীর সব মানুষের সাম্যের অধিকার স্বীকার করত।

তারাপদ'র চোখ জ্বালা করে। যেন বারুদের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে উঠেছে।

ভিতরে সকলে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এই পৃথিবী সুন্দর, বেঁচে থাকা আরও ভাল। এই পৃথিবীতে সবাই শত্রু নয়—এখানে বর্মী মাঝির মত সহৃদয় লোক আছে, এই ব্রাহ্মণ গৃহস্থের মত দয়ালু মানুষ আছে। হোক না তাঁর স্ত্রী সন্দিগ্ধমনা। আর শোভা? চাঁপা ফুলের মত গায়ের রঙ। নারী। উঃ, সে কতদিন তার বৌ মীরাকে দেখেনি। প্রায় দেড় বছর। দেড় বছর আগে লিবিয়া থেকে আহত হ'য়ে ফিরে এসে সে দু'দিনের জন্য বাড়ী গিয়েছিল। মীরা। রূপসী পদ্মার জলে সে তার যৌবনকে পনের বছর ধরে ধৌত, পরিপুষ্ট করে ধলেশ্বরীর তীরে তারাপদ'র সঙ্গে বাসা বেঁধেছে। পদ্মার নির্জন চড়ায় শেষ ফাল্গুনের মধ্যাহ্নকালীন উদাস শোভার মত মীরা সুন্দর। আরও মনে পড়ে—আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, ত্রিপোলি······পিরামিড, হাজার বছর আগেকার প্রস্তরীভূত রাজারা (তারা নাকি আবার বেঁচে উঠতে পারে—এমনি বিশ্বাস ছিল তাদের) ·····আর রূপোর বালা-পরা, নাক পর্য্যন্ত ঢাকা আরবীয় নারীরা। কায়রোর কাফেতে, আলেকজান্দ্রিয়ার সস্তা হোটেলে তাদের তারাপদ সুরা-প্রমত্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে, তাদের সঙ্গে প্রেম করেছে নিছক দৈহিক প্রেম। তাদের দেহ ছিল সাহারার বালুকণার মত জ্বালাময়ী, কোমল; তাদের কণ্ঠে ছিল দুর্বোধ্য অথচ ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্নকারী সঙ্গীত আর চোখে ছিল রহস্যময় আরব্য রজনীর কামনাজর্জ্জর অন্ধকার। আর সেই আঁবলুস কাঠের মত চকচকে কালো নিগ্রো মেয়েটি······রাত কটা?

বাইরে বৃষ্টি থেমেছে, আকাশে মেঘ পাৎলা হয়ে উড়ে চলেছে। এবার চলা যাক। ব্রাহ্মণকে ডেকে কষ্ট দেবার দরকার নেই—আর এ ঘরেও ত কিছু নেই। তারাপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল। আঃ—মেঘ-মুক্ত চাঁদের আলোয় আবার সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়েছে, বৃষ্টিস্নাত গাছের পাতাগুলি রূপোর মত চক্‌চক্‌ করছে,—পা চালাও তারাপদ, পা চালাও। রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌, রাইট্‌, লেফ্‌ট, ডবল মার্চ…

তখনও ভোর হয়নি। হাল্কা অন্ধকার তখনও পাৎলা চাদরের মত পেছনের সহরকে জড়িয়ে রয়েছে। কেবল বুড়ীগঙ্গার জল চক্‌চক্‌ করছে। নৌকোগুলো তীরে বাঁধা। মাঝিরা ঘুমাচ্ছে। আসন্ন বিদায়ের বেদনায় শেষ রাত্রি স্তব্ধ। বাতাস নেই অথচ একটা মিষ্টি ঠাণ্ডার আমেজ, একটা তন্দ্রালস প্রশান্তি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত।

বুড়ীগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে তারাপদ চারিদিকে তাকাল।

এই নদীর ওপারে, সবুজ ধান আর পাটের খেতের মাঝখান দিয়ে, অজস্র খাল বিলের পাশ দিয়ে, সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা মাটীর গন্ধে ঝিমোনো বাতাসে তার বুক পরিপূর্ণ করে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে চলতে চলতে সে থামবে গিয়ে কলাতিয়ায়। তারপরে মা আর বাবা আর মীরা আর তার ছোট ছেলেটা। কেমন দেখতে হয়েছে সেটা?

ভাবতে ভাবতে তারাপদ'র ঘুম পায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে খানিকক্ষণ স্বপ্ন দেখে।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গতেই সে এগিয়ে একটি ছোট ডিঙ্গির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বুড়ো মুসলমান মাঝিটি ঘুমাচ্ছে।

"ও মাঝি ভাই, শুনছ—ও মিঞা—"

"আল্লা-রহিমতুল্লা—কেডা?" মাঝি তার ঘুমন্ত গলায় বাঙাল ভাষায় জিজ্ঞেস করল।

তারাপদও সেই ভাষাতেই বলল,—

"আমাকে ওপারে পৌছে দেবে মিঞা ভাই ?"

"হুঁ—দেব, কিন্তু চার আনা লাগবে কত্তা—"

চার আনা! তা হোক্, তারাপদ'র কাছে এখনও টাকা খানেক আছে।

"তাই দেব—চল তুমি।"

"আসুন নায়ে বাবু—"

তারাপদ নৌকায় চড়ে বসল। মাঝি নদীর জলে চোখ মুখ ধুয়ে নৌকো ছাড়ল।

নৌকো চলতে থাকে আস্তে আস্তে। মাঝির পেশল বাহুতে, পায়েতে তখনও ঘুমের নেশা। লগি মেরে সে নৌকোকে ক্রমে গভীর জলের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। নৌকো চলল হেলে দুলে, বুড়ীগঙ্গার জলকে ভেদ করে, সশব্দে।

"মাঝি ভাই—"

"বাবু ?—"

"দেশের কি খবর ?"

"আর দেশের কি খবর বাবু, দিনকাল বড় ভাল না। জিনিষপত্রের দাম যুদ্ধের জন্য এত চড়ে গেছে যে কি বলব—! সে পুরানো দিন আর নাই—"

বুড়ো মাঝি তার যৌবনের দিনের কথা ভাবে। তখন দেশে অর্থ ছিল, খাদ্য ছিল। তার ঐ পেশল বাহু, বক্ষ আরও দৃঢ় ও কঠিন ছিল। তখন বুড়ীগঙ্গার জল আরও গভীর ছিল, রাতের বেলায় তখন জলদস্যুদের নৌকো ঘুরে বেড়াত লুটের আশায়। আঃ সে পুরানো দিন আর নেই—

যুদ্ধ। তারাপদ ভাবে। জলের স্রোতের শব্দ শুনতে শুনতে সে আবার ভাবে। কেন মানুষ যুদ্ধ করে ? জোসেফের কথা মনে পড়ে

—তার মুখে লতিফ শুনেছিল আসল কথা। লতিফ ইংরিজি একটু জানত। জোসেফ বলেছিল যে, এসব যুদ্ধ হয় একজন দু'জনের লোভের জন্য। উঃ, কি লোভ এই সব মানুষদের। তাদের সারা পৃথিবী দিলেও খুসী হবে না, হয়ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহকেও অধিকার করতে যাবে। এদেরই জন্য কোটী কোটী লোক বেঁচেও বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর রূপ, রস, বর্ণ, বৈচিত্র্য তাদের কাছে তাই ছবির মতই মিথ্যা থেকে যায়। কিন্তু কেন? পৃথিবীটা ত' তাদেরও—

বুড়ো মাঝির গলা শোনা যায়, "বুঝলেন না কত্তা—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—আর আমাদের পরাণ যায়—"

রাজা! রাজাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। জোসেফ বলেছিল। জোসেফ মারা গেছে। বায়ু-নিঃশেষিত বেলুনের মত। যুদ্ধ! ছিন্ন-ভিন্ন নরদেহ, রক্তকর্দম, কাৎরানি, ধোঁয়া আর শব্দ। বোমা, এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক আর মেশিনগান। সৈনিকগণ, অগ্রসর হও। থাম। কনুয়ের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। মাথার উপর শিষের মত শব্দ করতে করতে ছুটুক গুলী। ওঠ। দৌড়োও। বেয়োনেটকে উদ্যত করে সমূলে বিঁধিয়ে দাও শত্রুদের বুকে; লাল রক্তের ছিটে লাগুক তোমার বুকে। কিন্তু তা ভেদ করবে তোমার দেহকে—নিঃশব্দে। অসংখ্য অদৃশ্য রোমকূপের মধ্য দিয়ে তোমার রক্তের মধ্যে তা মিশবে। মৃতেরা বাঁচবে তোমার মধ্যে। তুমি মারতে পার না তারাপদ, মানুষকে মেরে শেষ করতে পার না।

তারাপদ'র মনে পড়ে একদিনের ছবি। পাগলের মত তখন তারা লিবিয়ার একটি শত্রুদের ঘাঁটি নিতে যাচ্ছে, হাতাহাতি বেশ খানিকটা যুদ্ধ হয়েছিল। সেই সময় সে একজন জার্মান সৈনিককে দেখতে পেল। তার দু'টো পা হাঁটু থেকে উড়ে গেছে, বাঁ হাতটায় বেয়োনেটের খোঁচা। তাকে দেখেই সে তার বেয়োনেট

উঁচিয়ে সোল্লাসে এগিয়ে গেল। রক্তের গন্ধে তখন তার মাথা ঝিমোচ্ছে।

জার্মানটি তার দিকে কাতরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কি কথা বলেছিল তা সে জানে না। কিন্তু সে যা বলেছিল তা সে বুঝতে পেরেছিল। তার কাতর অশ্রুসমাকুল দৃষ্টি, থরথর ঠোঁট, চাপা কান্নায় ভারী গলা—সবই তার কথায় সায় দিয়ে, মানুষে মানুষে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে, শত্রুতা ভুলে এই কথাই বলেছিল—"বাঁচাও ভাই, আমায় মের না, আমিও মানুষ—" কিন্তু সে শোনেনি, তার দক্ষিণের পাঁজরার ভেতর এমন জোরে সে বেয়োনেটের খোঁচা দিয়েছিল যে তার পাঁজরাগুলো পাট কাঠির মত মট্ মট্ করে উঠেছিল—কেন মানুষ যুদ্ধ করে? যুদ্ধ! কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, ত্রিপোলি, তব্রুক। আলেকজান্দ্রিয়ার সেই স্পেনদেশীয় বারবণিতা। তার চোখে ছিল ধারাল ছুরীর শাণিত ঝলক। আর সেই তব্রুকের অনতিদূরে—সেই নিগ্রো মেয়েটি—যার চোখে ছিল আফ্রিকার অন্ধকার অরণ্যের বিভীষিকাময় রহস্যের কালিমা—……

"নামেন বাবু—"

নৌকো তীরে ভিড়েছে। তারাপদ নাম। তোমায় যেন কেউ না চেনে, তুমি পলাতক। ধরা পড়লে তোমার জেল নয় তো মৃত্যু।……

খালেতে জল বেশী নেই। এখন জ্যৈষ্ঠ মাস, এর আগে দু'এক পশলা বিষ্টি হ'য়ে গেছে, তারি জন্য খালের জল ঘোলাটে। খালটা তারাপদ পায়ে হেঁটেই পার হল। মোটে এক কোমর জল।

খালটা পেরিয়ে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে অগ্রসর হল মান্দার গাছের ঘনবসতির মাঝখান দিয়ে। দূরে, বাঁশঝোপের একপাশে তাদের টিনের বাড়ীটা উঁকি মারছে। তারাপদ'র সারা দেহে একটা নতুন শক্তির সঞ্চার হল।

বাড়ীর সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। সব তেমনি আছে, কেবল চালার ওপরে লাউয়ের লতাটা আরও ঘন হয়ে উঠেছে, দাওয়ার মাটী কিছু খসে পড়েছে, বাঁশের বেড়ার যায়গায়-যায়গায় ভেঙ্গে গেছে।

দাওয়ার ওপর একটি বছর তিনেকের নগ্নশিশু খেলা করছে, তার কোমরে একটা ঘুন্‌সী বাঁধা, আর কোনও আভরণ নেই। ছেলেটি যেন চেনা চেনা। তার সুগৌর মুখ, কোঁকড়া চুলের রাশি, ব্রহ্মদেশে দেখা ধ্যানী বুদ্ধের মত আয়ত অথচ স্বপ্নালস ও শান্ত দৃষ্টি দেখে একজনের কথা মনে পড়ে তারাপদ'র। সে মীরা। একি তারই ছেলে?

"এসো বাবা—এসো—" তারাপদ ডাকল।

ছেলেটি সবিস্ময়ে তার দিকে একটু তাকাল, তারপরে দরজার চৌকাঠের দিকে তাড়াতাড়ি হেলতে হেলতে টলতে টলতে গিয়ে আধ আধ স্বরে ডাকল—"মা—"

"কেনরে সোনা?" ভেসে এল একটি নারীর কণ্ঠস্বর। সে আওয়াজে তারাপদ কেঁপে ওঠে আনন্দে। মীরার গলা।

"কি হল তোর—এ্যাঁ—" বলতে বলতে একটি যুবতী বাইরে এল। কিন্তু তারাপদকে পেছন থেকে একটু দেখেই দ্রুতপদে ঘোমটা টেনে চলে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য তারাপদ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মীরার দু'গাছি চুড়ি-পরা শুভ্র হাতের ভঙ্গিমা, তার জলে ভেজা দুটি নিঁখুত পায়ের ত্বরিৎ গতি।

তারাপদ নিজের মনে একটু হাসল। মীরা তাকে চেনে নি।

ছেলেটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—তার দিকে। তার ছেলে।

"এসো বাবা, এসো—কোলে এসো—" সে ডাকল।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে একটি বৃদ্ধার আবির্ভাব হল।

"কে বাবা—কি চাও?"

তারাপদ আস্তে আস্তে বৃদ্ধার দিকে তাকাল।

বৃদ্ধার হঠাৎ কথা থেমে গেল। তার সারা দেহ ধীরে ধীরে কাঁপতে লাগল, চোখ দু'টি ক্রমে স্তিমিত, অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল।

তারাপদ ডাকল—"মা আমি তারা—"

মা এবার কেঁদে ফেলল—"তারা—তুই তারা—" আর কিছু তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ের ধূলো নিল। মায়ের চেহারা অনেক বদলেছে, মাথার চুলগুলি আরও পেকেছে, কোমরটা আরও ভেঙ্গে পড়েছে, ফুলো ফুলো গাল দু'টো ভেঙ্গে গেছে।

মাও ছেলেকে দেখে। ছেলেকে চেনাই যায় না। তার মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, ভাঙ্গা গালের উপর দুটি পদ্মফুলের মত সুন্দর চোখে আভা নাই আর তার ছেলের সেই পাহাড়ের মত চেহারাও নাই, অনেক রোগা হয়ে গেছে।

ছেলেকে মা বুকে জড়িয়ে ধরল।

নগ্ন ছেলেটি ডাকল—"ঠাম্মা—"

ঠাকুমা'র চমক ভাঙ্গল—"ওরে তারা, বাছাকে কোলে নে, কোলে নে। আহা, তোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম সোনাদাদু—জানিস তারা—ওর নাম রেখেছি কার্ত্তিক—এসো দাদু, বাবার কাছে এস—"

তারাপদ ছেলেকে কোলে টেনে নিল। ছেলে একটুও কাঁদল না বা ভয় পেল না। তারাপদ ভারী খুসী হয়, ছেলে তাকে চিনেছে। রক্তের সম্পর্ক যে।

"বাবা কোথায় মা?"

"গেছেন কোবরেজের কাছে—আজকাল রাতে প্রায় চলতেই পারেন না—অ' বৌ'মা—কাতুর বাবা এসেছে গো—

তারাপদ ভেতরে ঢুকে নিজের ঘরে গিয়ে বসল। ঘর তেমনি

আছে। ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। কুলুঙ্গীতে মা কালীর পট। মীরার পুজো হয়ে গেছে। ভগবান, জোসেফ বলেছিল—'ভগবান! সে আবার কে?'

"ছুটি নিয়ে এসেছিস বুঝি তারা, জিনিষপত্তর কৈ?"

"আনি নি।"

"কেন?"

"ছুটী নিয়ে আসিনি মা—পালিয়ে এসেছি—"

"তাই নাকি?" মা খুশী হয়ে উঠল—"বেশ করেছিস—আর চিন্তা করতে পারি না বাবা। না খেতে পেয়ে মরতে হয় তাও ভাল—চোখের সামনে মরবি, কিন্তু যুদ্ধে কোথায় সকলের নাগালের বাইরে, কত হাজার মাইল দূরে—না বাবা, যাসনি কোথাও—"

"কিন্তু আমার কথা জানতে পারলেই পুলিশ আমায় ধরে নিয়ে যাবে মা, আমার পেছনে ওয়ারেণ্ট আছে। ধরা পড়লে আর নিস্তার নেই, আর ফিরতে পারব না—হয় জেল না ত মরণ—"

মায়ের চোখে ভয়ের চিহ্ন। দরজার আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তার ফুলের মত দেহের গন্ধে বাতাস মদির।

হ্যাঁ মা—আজই, কিম্বা কাল এখান থেকে আমি চলে যাব, যাব পিশেমশাইয়ের ওখানে—বিড়ুলিয়াতে—এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাব—"

বাবা এসে ঢুকল ঘরে। তারাপদ প্রণাম করে। বাবার বাতরোগ যেন ক্ষণেকের জন্য সেরে যায়। যে মানুষ চলতে পারে না, সে-ও খাড়া হয়ে দাঁড়ায়।

"তারা—কবে এলি বাবা?"

"এখুনি বাবা—"

তারপরে আরও অনেক কথা হল। যুদ্ধের কথা, কি করে মনের

খোলস দিন দিন বদলে বিশ্রী হয়ে যায় তার কথা আর নিঃসঙ্গ, আত্মীয়হীন জীবনে তার কতবার মৃত্যু এসেও ফিরে গেছে তার কথা। দরজার আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে সব কথা। কাতু। তার ছেলে। এই তারাপদ'র বাড়ী। এখানে মরুভূমির বালু নেই, অপরিচিত দেশের ভয়াবহতা নেই, নেই বারুদের গোলা আর ঝক্‌ঝকে বেয়োনেটের আড়ালে শত্রুদের নির্মম মুখ। এখানে শুধু শান্তি। দারিদ্র্য আছে, অভাব আছে কিন্তু তবুও শান্তি আছে। দরজার আড়ালে কার কোমল বুকের স্পন্দন যেন দ্রুত হ'য়ে উঠেছে।

মা, বাবা একটু পরে অন্য ঘরে চলে গেল। লঘু পদশব্দ ধ্বনিত হল। রূপসী পদ্মার একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল তারাপদ'র সামনে। ভরা নদীর টলমল জলের মত পরিপূর্ণ তার যৌবন অথচ গ্রীষ্মের নদীর শীর্ণতাও আছে। বসন ভূষণে কোনও পারিপাট্য নেই। পদ্মার গভীরতার মত দু'টি গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন চোখের নীচে চিন্তার কালিমা। মীরা।

তারাপদ উঠে দাঁড়াল—এগিয়ে গেল সে সাগ্রহে।

মীরা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তার চোখ দিয়ে জলও পড়ছে। সে আর মাথা তোলে না। তার স্ত্রী। একে ছেড়ে সে কোথায় গিয়েছিল? আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, তব্রুক, ব্রহ্মদেশ। সেই সব নারীরা—যারা—মত্ততার মুহূর্তে, মৃত্যুর অস্তিত্বে ক্লান্ত ভারাক্রান্ত আবহাওয়ার অন্ধকারে এসেছে তার জীবনে, তাদের সঙ্গে কত পার্থক্য এই মীরার। পদ্মার তীরের রূপসী, ওঠ, বুকে এসো।

তারপর মীরার গলা শুনতে পায়—"আর কোথাও যেয়ো না গো, দিনরাত, সারাক্ষণ ধরে পারি না এ যন্ত্রণা সইতে। প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হয়—কখন বুঝি মুছল আমার সীঁথির সিঁদুর। ওগো শুনছ —আর যেও না কোথাও, বল যাবে না—বল—"

মীরা কাঁদছে। পদ্মাতীরের মীরা। সে রাজকন্যার মত সুন্দরী। যে কত চন্দ্রালোকিত রাত্রে পদ্মার তীরভূমিতে সখীদের সঙ্গে বসে কাঞ্চনমালা, মণিমালা আর কত শত রাজকন্যাদের গল্প শুনেছে, কল্পনায় অসীম আকাশেরও সীমা খুঁজে পেয়েছে, সে কাঁদছে আর তোমায় যেতে মানা করছে যুদ্ধক্ষেত্রে। সৈনিক তার কি জবাব দেবে তুমি ?

তারাপদ মীরাকে টেনে তুলল। মীরার দুটি হাত তার কণ্ঠদেশ নাগিনীর মতন হিংস্রভাবে জড়িয়ে ধরল।

সারাদিন তারাপদ বাড়ীতে রইল। তার ঘুম পেয়েছিল কিন্তু মীরা কাজ সেরে আসতেই তা কেটে গেল। কারও সঙ্গে সে দেখা করতে পেল না। উপায় কোথায় ?

কিন্তু সন্ধ্যে হবার খানিক আগে সে আর তিষ্ঠোতে পারল না। বহুদিনের অদেখা নির্জ্জন পথগুলো, ধলেশ্বরীর তীর তার মনকে নিরন্তর আকর্ষণ করতে লাগল।

চুপে চুপে সে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম করল। কিন্তু ধরা পড়ে গেল মীরার কাছে।

"কোথায় যাচ্ছ গো ?"

"একটু বেড়িয়ে আসিগে বৌ।"

"কেন আজ জিরোও না—এতদিন ত' হেঁটে বেড়ালে—"

মীরা তারাপদকে চোখের আড়াল করতে চায় না। কে জানে কি হবে। এতদিন ত' ছিল কোথায় কোন দূর দেশে। আজ যে সে এসেছে তা যেন এখনও বিশ্বাস হয় না মীরার। এটা যেন একটা স্বপ্নের ঘোর। তাই মীরা চায় যে, তারাপদ আজ সারাক্ষণ তার চোখের সামনে, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকুক, তার আগমন তার কাছে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হোক।

কিন্তু তারাপদ মাথা নাড়ল—"না বৌ, একটু ঘুরে আসিগে—"

"যাবে তা বেশ, কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি এসো, নইলে তোমায় বন্দী করা হবে—"

তারাপদ হেসে উঠল, পায়ে পা লাগিয়ে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করে বলল—"ইয়েস কম্যাণ্ডার—"

মীরা খিল খিল ক'রে হেসে উঠেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে রান্নাঘরে ছুটে পালাল।

পথ। দেবদারু, আম, জাম আর কাঁঠাল গাছের নীচে পড়ন্ত রোদের খেলা।

তারাপদ লুকিয়ে হাটের পিছন দিক্‌কার রাস্তা ধরে, সাহাদের জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ধলেশ্বরীর দিকে এগিয়ে চলল। দূরে সাহাদের বড় অট্টালিকা দেখা যায়। সাহারার মরুভূমি। খামাদান ঝড় বয়ে চলেছে, বালুস্তম্ভের ঘূর্ণ্যমান বাতি। আকাশে প্রসারিত-পক্ষ অতিকায় চিল গর্জ্জন করছে। ঐ যে দূরে নদীর জল চকচক্‌ করছে। বিউগলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—তাঁবু ভাঙ্গ সৈনিকগণ, শত্রুরা আসছে। কি ভাবছে তারাপদ?

ধলেশ্বরী। শীর্ণা রূপসীর সঙ্গীতের মত তার জলকল্লোল। বাদামী পালওয়ালা একটা নৌকা তীরে নোঙর ফেলে রয়েছে, দূরে তার বক্ষ ভেদ করে তিনটে মহাজনী নৌকা দিগন্তের দিকে ভেসে চলেছে। তীরের ওপরে একটা ছাগল ঘাস খাচ্ছে, তার একটা বাচ্চা স্তন্যপান করার জন্য লাফালাফি করে তাকে জ্বালাতন করছে। একটা প্রজাপতি গান গেয়ে কোথায় উড়ে গেল! গাঙচিলেরা জলের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই কবে শোনা ছোটবেলার গল্পগুলো মনে পড়ে। মাঝিরা বলেছিল তাদের স্বপ্নের কথা। সোনার ময়ুরপঙ্খী নৌকা আর রূপোর ইলিস মাছ নাকি

আছে ধলেশ্বরীর গর্ভে। রূপকথা। আকাশের সূর্য্য বেচারা হঠাৎ রাতের কালো কুন্তলের ছায়া দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। আঃ-কাব্যের মত মিষ্টি এই পারিপার্শ্বিক। একটি অদৃশ্য ছন্দের স্রোত বয়ে চলেছে এই আকাশ বাতাস, সূর্য্য, জল, গাছপালা, মাটী আর তারাপদ'র মধ্য দিয়ে। কম্‌রেডগণ, কেন এই রেষারেষি, এই সুন্দরী পৃথিবী ত' সকলেরই মা। তারাপদ ভীরু নয়, কিন্তু কার জন্য যুদ্ধ করবে সে? সত্য, ন্যায়, মনুষ্যত্ব—তারা কোথায়? সে কেন যুদ্ধ করবে পরের জন্য—যারা তাদের শোষক। আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, ······সেই নারীরা, আর তব্রুকের সেই নিগ্রো মেয়েটি। মসৃণ আবলুসের মত নিখুঁত কালো ছিল তার রঙ। স্বল্প পোষাকের আড়াল থেকে তার যৌবন-পরিপুষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের ইন্দ্রিয়কে কলুষিত আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারপরে সেই দিন রাত্রে—

কুনওয়ার বলল—"চল্ দোস্ত্‌সব, একটু বেড়িয়ে আসি—"

রাত্রিবেলায় তাঁবুর বাইরে যাবার নিয়ম ছিল না, চারদিকে কড়া পাহারা।

হীরা বলল—"হ্যা—ঘুমও আসছে না, চল ভাই একটু বেড়িয়ে আসা যাক—"

মুকুন্দ আর লতিফ, ওরাও রাজী হোল। প্রথম লাইন তখন পাঁচ মাইল এগিয়ে গেছে জার্ম্মাণদের পশ্চাদ্ধাবন করে। রাত্রিবেলায় অতর্কিতে তারা তাদের আক্রমণ করেছিল।

রাত তখনও বেশী হয়নি। সবে দশটা। বাতাস বইছে, কিন্তু তাও গরম। মাঝে মাঝে দূরাগত মেঘগর্জ্জনের মত কামান আর বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসছে।

খালি পায়ে তাড়া দৌড়তে আরম্ভ করল নিগ্রোপল্লীটির দিকে। তখন অন্ধকারে—একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করে নিগ্রোপল্লীর

লোকেরা তার চারদিকে গোল হয়ে বসে গান বাজনা করছিল। ঢাকের মত একটি বাদ্যের গুম্ গুম্ শব্দে চারদিক কেঁপে উঠছে, একটি মেয়ে আর একটি ছেলে মাঝখানে নাচছে। পেছনের লোকেরা গাইছে একটি প্রাচীন সঙ্গীত, যার ভাবে আর ভাষায় রয়েছে আদিম অরণ্যের ভয়াবহ অথচ মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য। নৃত্যরত যুবক যুবতীর কালো দেহ কম্পিত আলোতে চক্চক্ করছে।

একপাশে একটি বছর পনেরর নিগ্রো মেয়ে বসে তাল দিচ্ছিল, তার অনাবৃত বক্ষে নবীন বসন্তের কৃষ্ণকলি, তার চোখে স্বপ্ন। কুনওয়ার সোল্লাসে অস্ফুট শিষ দিল—"চিজ্ টা ভালা আছে, না রে তারাপদ?"

তারা সকলে মাথা নেড়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি উঠল, উঠে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। তখনও গান চলছে। সে কালো দেহের নিচেকার কালো আত্মার সঙ্গীত, রক্তের সমুদ্রে তা' সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে। গান চলছে। 'কোয়াবাড়া আঙডুবা'—রাতের যৌবন সবে সুরু হয়েছে।

কুনওয়ার বলল—"চল্ পিছে পিছে—"

তারপরে অন্ধকারে যুবতীর আর্ত্তনাদ। অন্ধকারে তারা একের পর এক নিজেদের পাশবিক কামনা চরিতার্থ করল। লতিফ মেয়েটার মুখে রুমাল গুঁজে দিয়েছিল।

তারপরে যখন তারা চলে আসছিল—তখন শক্ত মাটীর উপর দিয়ে নগ্ন ও রক্তাক্ত দেহে, পাঁচটি পশুর নখদন্তের আঘাতচিহ্ন নিয়ে মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে চলবার চেষ্টা করছিল। তার নিম্নাঙ্গ তখন যন্ত্রণায় অসাড়। মুখ দিয়ে তার এক অস্ফুট গোঙানির শব্দ কেবল থেকে থেকে বেরোচ্ছিল, কিন্তু দূরের কামান নির্ঘোষ আর সঙ্গীতের তালে তা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। রাতের যৌবন সবে সুরু হয়েছে।'

তারাপদ শিউরে উঠল। কি করে সে তখন জ্ঞান হারিয়েছিল! একদিন তাকে সুদে আসলে এই অত্যাচারের প্রতিফল পেতে হবে। যুদ্ধ। জীবনকে কি করে দেয় ঝক্‌ঝকে বেয়োনেটের স্পর্শ! সন্ধ্যে হয়ে এলো—

দুজন লোক পশ্চিম দিক দিয়ে আসছে। তারাপদ চলতে আরম্ভ করল।

"আরে কে? তারাপদ না?"

থানার দারোগা অজিত বাবু! সর্ব্বনাশ। আফ্রিকার অরণ্য থেকে অকস্মাৎ একটা হিংস্র বাঘ লাফিয়ে এল।

তারাপদ মুখ না ফিরিয়ে চলতে লাগল দ্রুতপদে।

"এই তারাপদ—শোন—এই—"

তারাপদ দৌড় দিল। সৈনিক, তোমায় চিনে ফেলেছে।

বাড়ী ফিরে সে সব কথা সকলকে জানাল। রাতের শেষেই তাকে ঘর থেকে আবার বেরোতে হবে।

মীরার মুখ বেদনায় ম্লান হয়ে এল। পদ্মার বুকের ওপর মেঘের ছায়া।

সে বলল—"তখনই তোমায় বারণ কর্ল্লাম—"

তারাপদ নিজের দোষ বোঝে, কিন্তু উপায় কি। ছেলেকে কোলে করে সে ঘরের কোণে চুপ করে বসে রইল। রান্নাঘর থেকে পায়েসের গন্ধ ভেসে আসে। তার আগমন উপলক্ষ্যে আজ বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু সৈনিক, আর দেরী নেই। এবার কোথায়? রেঙ্গুন, না, রেঙ্গুন ত' গেছে।—

রাত তখন প্রায় দশটা হতে চলেছে। তারাপদ খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। বাবা নিজের ঘরে হুঁকো টানছে।

তারাপদ ভাবে। এবার? যুদ্ধের চাকরি ত' গেল, কি করে সংসার চলবে? হবে, হবে, নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে।

হঠাৎ বাইরে গাঁয়ের চৌকীদার বিপিনের বাঁজখাই গলা শোনা গেল—"ও মণ্ডল মশাই—দরজাটা খুলুন ত' একবার—"

মীরা দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ছুটে এল, ফিস্‌ফিস্ করে কেঁদে বলল—"ওগো—দারোগা পুলিশ এসেছে, তুমি পালাও—"

বিপিন আবার ডাকল—"আরে ও মণ্ডল মশাই—শুনছেন—"

কামানের গোলার আওয়াজের চেয়েও ভীষণ বিপিনের ডাক।

আহত পশুর মত তারাপদ লাফিয়ে উঠে একটা জামা গায়ে গলিয়ে নিল। মীরা বাইরে গেল।

বাবা, মা ঘরে এল। তাদের মুখে বিবর্ণতা।

মা জিজ্ঞেস করল—"পালাতে পারবি ত'?"—অস্বাভাবিক স্থির তার গলা।

বাবার বাম অঙ্গ থর্‌থর্ করে উত্তেজনায় আর বিচ্ছেদের দুঃখে কাঁপছে।

"মণ্ডল মশাই—দরজা খুলুন না—দারোগা সায়েব এসেছেন—"

ছেলের দিকে একবার তারাপদ তাকাল। রাজাদের সৈনিক হয়ো না পুত্র।

অন্ধকারে পেছন দিক দিয়ে তারাপদ মিলিয়ে গেল।

গাঁয়ের রাস্তাটা যেখানে মোড় ফিরেছে, সেখানে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল। তারাপদকে দেখেই সে তাকে জড়িয়ে ধরল।

"কে—কে?" তারাপদ'র ভীরু, চকিত কণ্ঠ।

প্রত্যুত্তরে কান্নার শব্দ শোনা গেল। রূপসী পদ্মার ঢেউ অন্ধকারে তারাপদ'র বুকে আছ্‌ড়ে পড়ে।

"আবার কবে দেখা পাব গো?—"

"তিনটে মাস কাটলে ওয়ারেণ্ট তামাদী হবে—তারপরে আসব। আর আমায় কেউ নিয়ে যেতে পারবে না মীরা—"এবার ছাড়—আর দেরী করা উচিত নয়।"

মোহিনী লতার বাঁধন ছিড়ল।

অন্ধকার পথ। পেছনে কান্নার শব্দ। থাক্‌। বিড়ুলিয়া নয়, আক্‌ছাইলে মাসীর ওখানে যাবে সে।

ঘণ্টা চারেক চলে তারাপদ আর পারে না। আশা, আকাঙ্ক্ষা, আত্মা, চেতনা, অনুভূতি, সুখ, দুঃখ, রক্ত, মাংস, অস্থি, শিরা—নানা বিচিত্রের সমাবেশে এই বিচিত্র দেহ ক্লান্ত। ঘুম চাই।

তারাপদ একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়ল। রাত শেষ হয়নি। নানা ছবিতে মাথাটা ভরপুর হয়ে ওঠে। পলাতক সৈনিক,...এবার? কেন সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না। তার যুদ্ধ ভাল লাগে না তবু কেন তাকে যেতে হবে যুদ্ধে! ঘুম আসে। কালোঘুম। সেই কালো নিগ্রো যুবতী। পাপ। কার পাপ? এক-জনের, দশজন লোভীর পাপের ফল সারা মানবজাতি ভোগ করবে। জোসেফ। মানুষ ভাই, তোমরা সবাই সমান। সভ্যতা। সভ্যতা ভেঙ্গে যাচ্ছে—বোমার আঘাতে সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে..... লণ্ডন, বার্লিন, প্যারিস, রেঙ্গুন—মানুষের বুদ্ধি মানুষকে ধ্বংস করছে। ধ্বংস-স্তূপের আড়াল থেকে নতুন সৃষ্টির অঙ্কুরোদ্গম হবে কি? মানুষের রাজ্য কবে হবে? রাজার রাজ্যে আগুণ লেগেছে। রাজা। রাজাদের দিন রক্তাক্ত অস্তের দিকে এগিয়ে চলেছে—মানুষ ভাই, পরের জন্য মানুষকে গুলি মেরো না। মূর্খ, রাজাদের প্রস্তরীভূত শবদেহে আর প্রাণ আসবে না......তারাপদ ঘুমোও—

অতলস্পর্শী বিস্মৃতির মধ্য থেকে তারাপদ'র চেতনাকে কে যেন হঠাৎ টেনে তুলছে। কে যেন তাকে ধাক্কা মারছে।

তারাপদ চোখ মেলল। নূতন সূর্য্যের আলোতে অসংখ্য প্রাণের বীজ।

"সুপ্রভাত—"

তারাপদ চমকে উঠল।

অজিতবাবু হাসল। সঙ্গে তার দুটি কনষ্টেব্‌ল।

"এই যে দারোগা বাবু—" তারাপদ হাসল। আর উৎকণ্ঠা নেই, আর চিন্তা নেই।

"চল আমাদের সঙ্গে, কেন মিথ্যে কষ্ট দিলে বাপু—"

তবুও তারাপদ একবার চেষ্টা করে। অজিত বাবুই তাকে যুদ্ধে নাম লিখে পাঠিয়েছিল—সে হয়ত বুঝবে তার তিক্ত, যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার কথা।

"অজিতবাবু—বিশ্বাস করুন, যুদ্ধের বিভীষিকা আর সহ্য করতে পারি নি বলেই—"

অজিতবাবু মাথা নাড়ল—"মিথ্যে বলছ ওসব কথা তারাপদ, আইনকে ফাঁকি দিতে আমি পারি না আর তুমিও পারবে না। মাসখানেক ধরে তোমার পরওয়ানা এখানে পড়ে রয়েছে, উঃ কি নাকালই না সারারাত করিয়েছ তুমি। নাও হে কেশরসিং, হাতকড়ি লাগাও—"

তারাপদ হাত বাড়িয়ে দিল। উপায় নেই। কালো ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও রঙ নেই।

"চল তারাপদ—"

"চলুন—"

তারাপদ সামনের দিকে তাকাল। মীরা, মা, বাবা, কানু। দুঃস্বপ্নে

দেখা প্রেতের দল। আবার যুদ্ধক্ষেত্র। লিবিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, ব্রহ্মদেশ। রাজারা মরছে। আবার ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দ, মেসিনগানের অগ্ন্যুদ্‌গার, বোমার বিস্ফোরণ, উদ্যত বেয়োনেটের মুখে মরণের বিদ্যুৎঝলক। আবার কলুষিত শূন্যপথে মৃত্যুর ডানা ঝলসাবে ট্রেঞ্চের মধ্যে, কাঁটার তারে, ছিন্নদেহের রক্ত পচবে—শুনছ—কেউ বাঁচবে না। আহাহা—কেউ বাঁচবে না, এই সুন্দর পৃথিবীতে সন্ধ্যার লাল সূর্য্য কেউ দেখবে না, ছোট ছোট কাতুরা আর খেলবে না—হাসবে না; পদ্মা তীরের রূপসীরা তারাপদ'দের বুকে উন্মত্ত সঙ্গীতের ছন্দ জাগাবে না—ফুলেরা কেউ ফুটবে না—

তাই ভাল। পায়ে পা লাগাও সৈনিক, মাথাটা খাড়া কর,' স্থির দৃষ্টি সামনে রাখ, তারপর চল। লেফ্‌ট, রাইট্‌, লেফ্‌ট, রাইট্‌—লেফ্‌ট—

ত্রিশঙ্কু

ছোট ছেলেমেয়ে দুইটির ক্ষুধার্ত্ত কান্নার ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

নন্দলাল মুহুরি লাফাইয়া বিছানা ছাড়িয়া নামিল। উন্মুক্ত বাতায়নপথে শরতের প্রভাত সূর্য্যের উজ্জ্বল ও সোনালী আলো আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

নন্দলালের চোখের সম্মুখ হইতে নিদ্রার যবনিকা মিলাইয়া গেল। প্রতিদিন সে মধ্যরাত্রে ক্ষুধিত জঠরে বসিয়া বসিয়া অন্ধকার রাতের কৃষ্ণবর্ণ দেবতাকে প্রার্থনা জানাইয়া বলে, 'তুমি চিরস্থায়ী হও।' কিন্তু হায়, প্রতিদিন সে প্রার্থনা নিস্ফল হয়। আজও হইল।

ছেলেটির বয়স বছর দশেক। ছোট মেয়েটির বয়স আট বছর। তাহারা কাঁদিতেছিল।

ঘরে একদানা চাল নাই, এমন কিছুই নাই যাহা দিয়া উহাদের ক্রন্দন নিবারণ করা যাইতে পারে। অতএব নন্দলাল মুহুরির স্ত্রী বিমলা আর মেয়ে সীতা বারান্দায় বসিয়া মিণ্টু আর টুনির কান্না একমনে শুনিতেছিল। অনাহারেও তাহাদের বুদ্ধি লোপ পায় নাই।

"ক্ষিদে পেয়েছে মা"—মিণ্টু বলিতেছিল।

"মাগো—চাট্টি খেতে দে মা"—টুনি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।

নন্দলাল বাহির হইয়া আসিল।

"ওরা কাঁদছে কেন গো?"

বিমলা কোনও জবাব দিল না, শুধু একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

সীতা বলিল—"ওদের ক্ষিদে পেয়েছে"—

"কিছু নেই?"

"না।"

নন্দলাল মুহুরির দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিল।

"মা—শুনছ না? ওমা" টুনি ডাকিল।

"নেই? কিছু নেই? দেখ না মা একটু খুঁজে পেতে"—নন্দলাল বলিল।

সীতা মাথা নাড়িল—"নেই বাবা—কিছু নেই।"

"আর পারি না গো মা—চাট্টি খেতে দে।"

নন্দলাল ছেলেমেয়েদের দিকে চাহিল। যুবতী মেয়ে সীতা। তাহার সে সৌন্দর্য্য কোথায়? মিণ্টু, টুনি—তাহাদের বুকের পাঁজরাগুলি গোণা যায়—এক, দুই, তিন, চার—। দোষ নাই। কতদিন

যাবত একবেলা শুধু ফেন ভাত আর নূন খাইয়া তাহারা বাঁচিয়া আছে। পঁচিশ টাকা মাহিনার নন্দলাল মুহুরির মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে।

সে আবার ঘরে ঢুকিল।

ছিন্ন, ময়লা কামিজটা ধীরে ধীরে সে গায়ে দিল।

বিমলা নিঃশব্দ পদে তাহাকে অনুসরণ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। সে প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"এই একটু বাইরে, দেখি যদি কিছু হয়।"

"কি আবার হবে? কে তোমায় ধার দেবে বলত?"

"তাহলে?" নন্দলাল একবার স্ত্রীর দিকে চাহিল। শীর্ণা বিমলা —তাহার দেহে একটি শাঁখা ও লৌহ বলয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। নন্দলাল কৈলাস স্যাকরার দোকান চেনে। স্ত্রীর গহনা সে সেখানে এক এক সব দিয়া আসিয়াছে। আর নাই।

"বিমলা"—

"এঁ্যা?"

"তোমার কাছে কি সোনাদানা আর কিছুই নেই?"

বিমলা মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িল, "না"।

মিন্টু কাঁদিতেছে—"অদিদি তোর পায়ে পড়ি।"

"তাহলে?" নন্দলাল আবার ভাবে।

"আমি বলছি শোন, পেতলের একটা থালা আর একটা ঘটি আছে, তাই নিয়ে কাঁসারীর দোকানে যাও, দেখ যদি কিছু হয়।"

"খাবে কিসে?"

"ঐ একটা থালাতেই চলবে—ডেক্‌চীতে রান্না করব, কড়াই আছে, ছুটো বাটী আছে, বালতিটা আছে"—

"ওতেই আমাদের চলে যাবে?"

"হ্যাঁ গো"—

"আচ্ছা। তাই দাও, তাই এনে দাও"—

টুনির কান্না ভাসিয়া আসে।

[কম্‌রেড! তুমি আমায় গল্প লিখ্‌তে বলেছ। তোমার জন্তই লিখ্‌ছি। ভোরের রঙীণ আলো প্রজাপতির পাখার মত সুন্দর, ওতে অজস্র জীবনের বীজ চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরতের শিউলি আর শিশির স্নাত ঘাসের গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে আমার বুকের ভিতরটা সুরভিত করে তুলছে। আমি বেঁচে আছি।

কম্‌রেড! ভেবেছিলাম তোমায় শোনাবার জন্ত একটি প্রেমের গল্প লিখ্‌ব কারণ প্রেম শাশ্বত। কিন্তু কে জানত যে অসংখ্য মৃতের ক্ষুধিত প্রেতাত্মারা এসে আজ আমার সে প্রেমের গল্পকে ভুলিয়ে দেবে? কম্‌রেড, আমায় ক্ষমা করো।]

অকস্মাৎ যেন কোথা হইতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধ করিয়াছে। নন্দলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের রকে বাড়ী-ওয়ালা তারক বাবু বসিয়া। চারি মাসের বাড়ী ভাড়া ষোল টাকা বাকী।

"এই যে! তারক বাবু—কেমন আছেন?" জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল নন্দলাল। ভারী খাপছাড়া সে হাসি।

"ভাল নয় মশাই"—তারক বাবু বলিল, "আর থাক্‌বই বা কোত্থেকে? আপনারা যা আরম্ভ করেছেন"—

"হেঁ হেঁ—কি যে বলেন—" নন্দলাল বোকার মত হাসিয়া বলিল। অন্তরাত্মা তাহার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, মস্তিষ্কের বুদ্ধি কোথায় যেন উধাও হইয়া গিয়াছে।

তারক বাবু ধমক্ দিয়া বলিল—"হেঁ হেঁ করবেন না মশাই—ভাড়া কবে দিচ্ছেন?"

"দেব—দেব বই কি, আরও কয়েকদিন সবুর করুন তারক বাবু"—থালা আর ঘটিটাকে আড়াল করিবার চেষ্টা করে নন্দলাল।

তারক বাবুর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ—নন্দলালের হাতের থালা ও ঘটি সে লক্ষ্য করিয়াছে, খানিকক্ষণ কটমট্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, "কাল সকালে আসব—চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাবেন, যদি কাল টাকা না পাই তবে বাড়ীতে আমি তালা লাগাব।"

হন্ হন্ করিয়া তারক বাবু চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত নন্দলাল দাঁড়াইয়া রহিল।

মিণ্টুর কান্নার শব্দ গলিতে দাঁড়াইয়াও শোনা যায়।

নন্দলাল পা বাড়াইল। চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে।

গলির শেষে, বড় রাস্তার সম্মুখে চরণ কাঁসারীর দোকান।

চরণ ভাল করিয়া থালাটি ও ঘটিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। পরীক্ষা শেষে সেগুলি একপাশে রাখিয়া হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিল।

"নেবে ত?" নন্দলাল আশঙ্কায় প্রশ্ন করিল।

"উঃ, হুঁ—কিন্তু বড় পুরানো"—

"না ভাই, মাত্র দু'বছর আগের কেনা"—

"হুঁ—তা তিনটাকার বেশী ত' হবে না।"

"বল কি ভাই! আজকালের বাজারে ওগুলোর দাম কম করেও আট টাকা দেওয়া উচিত।"

"অন্য দোকানে যান মশাই, অন্য দোকানে যান। লোকে খেতে পায় না—থালা বাটি কিন্‌লে কি পেট ভরবে যে দাম বাড়িয়ে বিক্রী করব?"—

"আর কিছু দেও—তিন টাকা বড় কম।"

"এক কথা শুনবেন?"

"বল ভাই।"

"পাঁচ টাকা।"

'এক কথা'ই অবশেষে শেষ কথা হইল। পাঁচটি টাকা লইয়া নন্দলাল উঠিল।

মুদির দোকানে গিয়া নন্দলাল এক পাশে বসিল।

"এই যে নন্দবাবু—কি খবর?" বিশু মুদী জিজ্ঞাসা করিল।

"চলে যাচ্ছে ভাই"—

"তা আমার আটটা টাকা কবে দেবেন?"

"দেব ভাই দেব—শীগ্‌গীরই দেব।"

বিশু মুদী একবার মৃদু হাসিল, পরে কি ভাবিয়া বলিল, "কি চাই? এখন বলুন ত।"

"সাত সের চাল দিন।"

"কোন চাল?"

"এক সের সওয়া পাঁচ ছটাক করে যেটা"—

"দামটা দিন"—

নন্দলাল টাকা পাঁচটি বাহির করিয়া বিশুর হাতে দিল। বিশু তাহা গুণিয়া বলিল, "এতো আগের বাকী টাকার, তবে তিনটে এখনও বাকী রইল।"

"মানে?" নন্দলালের পায়ের নীচে মাটী নাই।

"মানে নগদ টাকা আরও পাঁচটি দিলে যা চান তা পাবেন। টাকা জলে ফেলার অভ্যেস আমার নেই।"

ব্যাকুল কণ্ঠে নন্দলাল বলিল, "ভাই বিশু—দয়া কর, আজ কিছু নেই আমার কাছে।"

বিশু নিজের চকচকে ভুঁড়ীর উপর হাত বুলাইয়া বলিল, 'মাফ্ করুন নন্দবাবু, ব্যবসাতে দয়া নেই।"

"আমার ছেলে মেয়েরা আজ না খেয়ে থাকবে ভাই—"

"আমার উপায় নেই—আমি গরীব দোকানদার"—

"হাত জোড় করছি তোমার কাছে—দয়া কর"—

বিশু জবাব দিল না।

নন্দলাল নিজের অঞ্জলিবদ্ধ হাতের দিকে একবার চাহিয়া দাঁড়াইল। পায়ে পড়িবে বিশুর? সে ভাবিল। পাগল, ভদ্রলোকের ছেলে সে—নীচের, নির্দ্দয়ের পা ধরিবে সে!

টলিতে টলিতে নন্দলাল রাস্তায় নামিল। মস্তিষ্কে কোনও চিন্তা নাই, দেহে শক্তি নাই, দৃষ্টিতে জ্যোতি নাই, জঠরে অন্ন নাই।

ছেলে মেয়েদের কান্নার শব্দ যেন এখনও ভাসিয়া আসিতেছে।

বেলা দশটা।

বাড়ী।

বিমলা আসিয়া দাঁড়াইল।

"বাজার করে আন নি গো?"

"না।"

"কেন?"

"টাকা নিয়ে নিল।"

"কে?" বিমলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

"বিশু মুদী।"

"কেন?"

"তার টাকা পাওনা ছিল যে"—

বিমলা চুপ করিয়া রহিল।

নিঃশব্দতা।

"আপিস যাবে না?" বিমলা প্রশ্ন করিল।

"হুঁ—যাব।"

"চান করে নাও"—

"না।"

"অত ভেবো না—ভগবান আছেন, একটা উপায় হবেই।"

"হবে? ভাল"—নন্দলাল হাসিল। বিশীর্ণ, প্রেতের হাসি। নন্দলাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কোথায় যাও?"

"আপিস"—

"চান করবে না?" বিমলা চোখ মুছিয়া বলিল।

"না—চান করলেই ক্ষিদে পাবে"—

নন্দলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

এমন সময় কোথা হইতে টুনি আসিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টান দিয়া বলিল—"দিলে না—বামুন মাসীরা চাল দিলে না—আমায় এবার খেতে দাও মা, আর পাচ্ছি না"—

নন্দলাল থমকিয়া দাঁড়াইয়া, মেয়ের দিকে চাহিল। পাঁজরার হাড়গুলি গোণা যায়। এক—দুই—তিন—চার—

([কম্‌রেড্! বাইরে শরতের রোদ্দুর শাণিত অস্ত্রের মত ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে,—বাতাসে শিউলির গন্ধ ম্লান হয়ে এসেছে, শিশিরের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে।

কম্‌রেড্! আমার হাতের এ কলম আর ভাল লাগছে না। ভাব্‌ছি—যদি আমার এই কাঠের কলমকে তুমি লোহার রাইফেলে রূপান্তরিত করতে পারতে। ভাব্‌চি—যদি আমার বুকের ভিতরটা বহু প্রাচীন প্রস্তরের মত কঠিন ও মমতাহীন করে তুলতে পারতে। ভাব্‌ছি কম্‌রেড! ভয় করোনা, শুধুই ভাবছি।])

মার্চেন্ট আফিস।

বড় বাবুর সম্মুখে গিয়া নন্দলাল দাঁড়াইল। যদি কয়টা টাকা হ্যাণ্ড্‌ভাজ্ পাওয়া যায় এই আশায়।

"এই যে নন্দলাল বাবু—একটা কথা আছে"—

"আজ্ঞে"—

"আমরা ভারী দুঃখিত যে, আমাদের লোকজন কমাতে হচ্ছে—আজকালকার অবস্থা ত জানেনই। তা' ছাড়া ফার্ম্মের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়"—

"আজ্ঞে"—

"তাই কাল থেকে অর্থাৎ তেইশ তারিখ থেকে আপনাকে আমরা আর রাখ্‌তে পারব না"—

"আজ্ঞে? কি—বল্‌ছেন?"

"ঠিক বলছি—তবে সত্যি আমরা ভারী দুঃখিত।"

অকস্মাৎ নন্দলালের প্রাণের স্পন্দন যেন থামিয়া যায়।

বাহিরে শরতের উজ্জ্বল আলোর সমুদ্রে অজস্র প্রজাপতির মেলা।

"দয়া করুন বড় বাবু—নইলে বৌ আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে মরে যাব"—

"আমি কি করব নন্দবাবু? আমিও ত' আপনার মতই চাকর। সায়েব দশ দিন বাদে আসবেন—তাঁকে বলবেন। হ্যাঁ—কাল থেকে আর তাহলে আপনি আসবেন না, আজ কাজ করুন।"

"বড় বাবু—দয়া করুন।"

"দয়া করার ক্ষমতা থাকলে করতাম বৈকি—যান, কাজ করুনগে। আপনার মাইনে পয়লা তারিখে নিয়ে যাবেন।"

বাতায়ন পথ দিয়া আকাশকে দেখা যায়। নীল, নীল আকাশ। অপূর্ব্ব।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে।

রাজপথে অজস্র জনতার ভীড়। কোলাহল, হাসি, নানারঙের পোষাক, স্বর্ণ আর আলো।

ফুটপাথে একটি লোক মরিয়া পড়িয়া আছে। অতি সূক্ষ্ম চামড়ার আবরণে আবৃত একটি কঙ্কাল।

নন্দলাল সেই মৃতদেহ দেখিয়া ভয়ে সরিয়া গেল।

তাহার পা ক্ষুধায় টলিতেছে—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, দৃষ্টি স্তিমিত।

কিছু নাই—পকেটে কিছু নাই।

ভিক্ষা করিলে কেমন হয়?

একপাশে দাঁড়াইল নন্দলাল। হাতটা বাড়াইয়া দিল জনতার দিকে।

কিন্তু মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না।

"দয়া কর"—অস্ফুট কণ্ঠে সে একবার বলিল।

জনতা নির্ব্বিকার।

হঠাৎ লজ্জায়, ধিক্কারে নন্দলালের হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি হাত গুটাইয়া লইয়া এদিক ওদিক সন্ত্রস্তভাবে চাহিল। না, কেহ দেখে নাই। পাগল হইয়া গিয়াছিল সে। ভদ্রলোকের ছেলে সে, ভিক্ষা করিবে!

বাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীর দ্বারপার্শ্বে একটি যুবককে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়—সে সীতার সহিত কথা বলিতেছে।

নন্দলাল দাঁড়াইল।

যুবকটি সীতার হাতে কি যেন দিতে গেল।

"সীতা"—নন্দলাল গর্জ্জন করিয়া বলিল।

যুবকটি হাত গুটাইয়া লইয়া এক লাফে গলির অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পাথরের মত নিশ্চল হইয়া সীতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"কে ওই ছোঁড়া"—

"ও বাড়ীর নিমুদা"—

"কি দিচ্ছিল তোকে ?"

"টাকা।"

"কেন ?"

সীতার চক্ষু সেই অন্ধকারে জলিয়া উঠিল, "খাবার জন্ত—আর পাচ্ছি না।"

নন্দলাল গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"চুপ্—খবরদার—ফের যদি দেখি, তবে তোকে খুন করে ফেলব। ক্ষিদে সহ্য করতে পার্চ্ছিস না? বেশ ত' তবে মর্—শুকিয়ে, কুঁক্ড়ে, তিলে তিলে মর্"—

"কি হয়েছে ?" বিমলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"কিছু না"—

নিজের ঘরে গিয়া বসিল নন্দলাল।

"কিছু পেলে গো ?" বিমলা প্রশ্ন করিল।

"না"—

বিমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কোথায় এবং কেন গেল তাহা নন্দলাল মুহুরি জানে। বিমলা কাঁদিতে এবং ভাবিতে গেল।

বাহিরে চীৎকার শোনা গেল—"নন্দবাবু—অ' মশাই"—

"কে ?"

"পাশের বাড়ীর সুরেশ বাবু"—বিমলা বাহির হইতে বলিল। "কেন ডাকে ?"

"জানি না।"

নন্দলাল বাহিরে গেল।

বাহিরে সুরেশ বাবু মিণ্টু আর টুনির কাণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া, সঙ্গে আরও দু' তিন জন লোক।

"এই যে মশাই—বেশ ছেলেমেয়ে আপনার, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! চোর মশাই—চোর এরা"—

"কি বলছেন!"

"বলছি কি আর সাধে—বৌ সবে রান্নাঘর থেকে ঠাকুর ঘরে গেছে—আর আপনার ছেলেমেয়ে এদিকে রান্না ঘরে গিয়ে সব গোগ্রাসে গিলছে! ভদ্র লোকের ছেলেমেয়ে—একি ব্যভার মশাই! লজ্জায় যে মরে যাই"—

নন্দলাল হাত জোড় করিয়া বলিল, "মাফ্ করুন সুরেশ বাবু—ওদের হয়ে আমি মাফ্ চাইছি।"

"বিলক্ষণ—তার কি দরকার! আপনি এদের আগে ঠিক করুন—বাল্যকালে চুরি বিদ্যাটি বড় মারাত্মক যে মশাই—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—

ছেলেমেয়ে দুইটি কাঁদিতেছে। সুরেশ বাবু তাহাদের যথেষ্ট প্রহার করিয়াছেন।

তবুও নন্দলাল তাহাদের চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া গেল।

"আহা ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও গো—যথেষ্ট মার মেরেছে ওরা"—বিমলা বলিল—

"না বিমলা—না।"

"মরে গেলাম গো মা—মরে গেলাম"—তারস্বরে চীৎকার করিয়া টুনি কাঁদে। মিণ্টুর চোখে জল, কিন্তু মুখে শব্দ নাই।

"আজ তোদের মেরেই ফেলব—চুরি কর্তে শিখেছিস্ শেষে! এঁ্যা?"

হঠাৎ হাত তুলিয়া ছেলেমেয়েদের কিল চড় মারিতে গিয়াই নন্দলালের হাত অবশ হইয়া আসিল। আহা, ছেলেমেয়েগুলির বুকের পাঁজরাগুলি গোণা যায়। এক—দুই—তিন—চার—।

রাস্তায় দৃষ্ট সেই মৃতদেহের ছবিটি নন্দলালের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তে গলা নামাইয়া সে বলিল, "বেশ করেছিস্ তোরা, আমি বাপ হয়েও খেতে দিতে পারি না বলে তোরা না খেয়ে থাক্‌বি কেন? চুরি করে খাবি—নিশ্চয় খাবি"—

কথা শেষ না করিয়া বাহিরের অপ্রশস্ত বারান্দার এক পার্শ্বে গিয়া নন্দলাল দাঁড়াইল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। বাড়ীতে তাহার কষ্ট হইতেছে।

গলির ভিতরটা ভারী অন্ধকার।

[কম্‌রেড্! আমি তোমায় বিশ্বাস করি। আমার এই কাঠের কলমকে তুমি লোহার রাইফেল করে দাও—আমার ভীরু, পলাতক ও দুর্ব্বল দেহ মনকে তুমি পাথর করে দাও। কম্‌রেড—আমার কথা রাখ।]

উদ্দেশ্যহীন, নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন ভাবে নন্দলাল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। আধো আলো, আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়া মহানগরীর বিচিত্র রূপের কালো ছবি দেখিয়া দেখিয়া নন্দলাল ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

আবার বাড়ীর দিকে।

রাত বাড়িয়াছে।

"বিমলা"—

"দরজা খোলাই আছে, এসো"—বিমলার ডাক শোনা গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার। কেরাসিন তেলের পয়সা নাই।

"বিমলা"—

"উঁ?"

"ঘুমোওনি?"

এই সব অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দিতে বিমলার ভাল লাগে না।

নন্দলাল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রি গভীর হইতে চলিল।

দূরে আকাশে চাঁদ উঠিতেছে। অন্ধকার একটু স্বচ্ছ হইয়া আসে। অস্পষ্ট আলোর ভৌতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে নন্দলাল দেখিল সীতা বারান্দার একপাশে শুইয়া রহিয়াছে, শীর্ণা যোগিনীর মত। তাহার তৈলহীন রুক্ষ চুলের রাশি আর ছিন্ন শাড়ীর অঞ্চল চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

নন্দলাল বিমলার দিকে চাহিল। বিমলা যেন একটি প্রেতিনী। তাহাকে দেখিয়া নন্দলাল মুহূর্ত শিহরিয়া উঠিল।

"বিমলা"—সে ডাকিল।

"কি ?" ক্লান্তকণ্ঠে বিমলা উত্তর দিল।

"মিণ্টু আর টুনি কোথায় ?"

"ওরা ঘরে শুয়েছে"—

"ওঃ—আচ্ছা বিমলা"—

"উঁ ?"

"কিছু খেয়েছ ?"

বিমলা জবাব দিল না।

"কোথেকেই বা খাবে ? আমি স্বামী, আমি কি কিছু আনতে পারি ?" নিজের চাকুরীর বিয়োগান্ত সংবাদটা একবার বিমলাকে জানাইতে ইচ্ছা হইল তাহার, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ভাবিল যে কি হইবে তাহা জানাইয়া, পরে আপনা হইতেই জানিবে।

নন্দলাল উষ্ণ স্পর্শে চমকিয়া উঠিল। বিমলা নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার দেহের উপর হাত রাখিয়াছে।

"তোমার কষ্ট হচ্ছে, না গো ?" বিমলা রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

ছেলেমানুষের মত বিমলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নন্দলাল বলিল, "আমি তুমি ত বড় নই বিমলা, ভাবছি ছেলেমেয়েগুলির কথা"—

বিমলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

অনেকক্ষণ তাহারা অমনিভাবে বসিয়া রহিল। পরস্পর বুকের ভিতরে যে শূন্যতার আলোড়ন আর জ্বালা জ্বলিতেছিল তাহা যেন প্রত্যেকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। অবশেষে বিমলা এক সময়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল।

সে বলিল—"রাতটা কাটিয়ে দাও কোনও রকমে—ভগবান আছেন, একটা কিছু হবেই।"

ভগবান? নন্দলাল হাসিল, "তুমি শোও বিমলা"—বিমলা মাটীতে শুইয়া পড়িল।

ভগবান? নন্দলাল আকাশের দিকে চাহিল। একখানি শীর্ণ চাঁদের আলোতে আকাশ অস্পষ্ট ভাবে আলোকিত—নক্ষত্রের দীপ্তি বিশেষ ম্লান হয় নাই।

আচ্ছা—তারা গুণিলে কেমন হয়? নন্দলাল ভাবে।

নন্দলাল ভাবিতে থাকে। রাজপথে দেখা সেই মৃত লোকটির মুখ মনে পড়ে। অবশেষে চাঁদ অস্তোন্মুখ হয়।

নন্দলাল ভাবে। চাকুরী গিয়াছে। বাজারে দেনা। অথচ প্রাণধারণের মত কিছুই নাই। দিন দিন অনাহারে দেহ শীর্ণতর হইবে। বাঁচিবার কি উপায় নাই? আছে। সীতার কাছে অন্ধকারে অনেক যুবক, অনেক পুরুষ আসিবে। সে টাকা বাজাইয়া গুণিয়া লইবে। মিণ্টু আর টুনি পরের বাড়ীর আনাচে কানাচে চুরি করিয়া খাদ্যলাভের চেষ্টা করিবে। পথের প্রান্তে কোথাও বসিয়া বিমলা হয়ত ঘোমটাটা একটু টানিয়া লিক্‌লিকে একটি হাত বাড়াইয়া দিয়া ব্যস্ত, মত্ত জনগণেশের দয়া ভিক্ষা করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিবে—"দয়া কর গো বাবা—বাঁচাও—চাট্টি খেতে দাও"—আর সে? মানে নন্দলাল মুহুরি? না; নন্দলাল এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে চাহে না। কাল

সকালে তারকবাবু আসিবে। না, নন্দলাল ভিক্ষা করিতে পরিবে না—স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লইয়া নীচে নামিতে পারিবে না। সে ভদ্রলোক।

তাহা হইলে কি করিবে নন্দলাল!

উপায় আছে বই কি? নিজের পরিধেয় খুলিয়া নন্দলাল ভাল করিয়া পাকাইল। পরে রান্না ঘরে গিয়া জানালার শিক ধরিয়া উপরে ঝাড় লণ্ঠন টাঙ্গাইবার যে হুকটা ছিল তাহাতে সে তাহা কোনও রকমে বাঁধিল। এই বাঁধাবাঁধিতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগিল, পরিশ্রমে তাহার অনাহারে দুর্বল দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অবশেষে কাপড়ের দড়ির মাঝে একটি ফাঁস তৈয়ার করিয়া অতি সন্তর্পণে নন্দলাল তাহা নিজের গলায় পরিল। তারপরে হঠাৎ সে নিজের দেহ ছাড়িয়া দিল।

কাপড়ের ফাঁস গলায় বসিতে লাগিল। বিমলা, সীতা, মিন্টু, টুনুর মুখের ছবি তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে কয়েকবার ভাসিয়া গেল।

অবশেষে নন্দলাল মুহুরির জীবন-মঞ্চের যবনিকা পাত হইল। কিন্তু তাহার পরেও তাহার দেহ মৃত্যুকালীন বেগের ও মুক্তিপ্রয়াসের নিষ্ফল চেষ্টার ফলে খানিকক্ষণ ধরিয়া দুলিতে লাগিল। অবশেষে তাহাও থামিল। নন্দলাল মুহুরি মরিল।

[কম্‌রেড্! নন্দলালেরা মরবেই! ত্রিশঙ্কুর বংশধর ওরা—স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি যে অনন্ত শূন্য তার মধ্যে ওরা চিরদিন দুলবে। নন্দলালেরা মরবেই।

আগুণ জালিয়ে লোহা পুড়িয়ে আমি লাল করেছি। আমার একটি রাইফেল চাই। কম্‌রেড্! তোমার হাতুড়ীটা তুলে ধর, আমার উত্তপ্ত লাল লোহা নরম হয়ে আছে— তাকে তুমি রূপ দাও।]

এই সীমান্তে

হঠাৎ ঝড় উঠিল। হাহা শব্দে পশ্চিম দিগন্ত হইতে অগ্নিময় ধূলাজালে বৈশাখী আকাশের সূর্য্যদগ্ধ শাণিত দীপ্তিকে ম্লান করিয়া দিয়া ঝড় আসিল। পাগলের মত।

আর চলা যায় না।

হারাণ ডাকিল, "ফুলী"—

ফুলী ক্লান্তপদে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেখান হইতেই সে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "কি ?"

"কষ্ট হইত্যাছে—না ?"

ফুলী মাথা নাড়িল। রৌদ্রে তাহার ক্ষুৎকাতর মুখমণ্ডল কালো হইয়া উঠিয়াছে—তদুপরি সে গর্ভবতী—পরিশ্রমে, অবসাদে সে ভাঙ্গিয়া

হারাণের কষ্টও কম নয়। তাহার ডান পা'টা একটু ছোট—চলাটা তাহার নিকট রীতিমত একটি কসরৎ।

কিন্তু না চলিয়া ভিক্ষুক-দম্পতির উপায় নাই। একজায়গায় আজকাল একবারের বেশী ভিক্ষা জোটে না।

"আর, এই গাছতলায় একটু জিরাইয়া লই"—

ফুলী নিরুত্তরে মাঠের প্রান্তের শিমূলগাছটার তলায় গিয়া বসিল। হারাণ পিঠের বোঁচ্‌কাটা নামাইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

ঐ বোঁচ্‌কাটাই তাহাদের সংসার। তিনটি টিনের বাটী, একটি থালা, একটি গেলাস। রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া দু'একটা সিগারেটের কৌটা; ছিন্ন কাপড়ের কতকগুলি টুক্‌রা ও একটি অতিময়লা কাঁথা।

হারাণ ফুলীর দিকে চাহিল। ফুলী হাঁপাইতেছে। তাহার ললাটে,

নাকে, গালে চক্‌চকে ঘামের স্রোত। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখ আর রুক্ষ ও কুঞ্চিত কেশের উপর ধূলার আস্তরণ পড়িয়াছে। গর্ভের ভারে তাহার সুগঠিত দেহের সৌন্দর্য্য চাপা পড়িয়াছে, অনাহারে তাহার চোয়াল দুইটি উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার চোখে, তাহার মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা, এক অপূর্ব্ব শ্রী যাহা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও অবসন্ন হারাণের স্নায়ুকোষেও উন্মাদনা জাগায়।

"ফুলী"—

"উঁ ?"

"কষ্ট হইত্যাছে—না ?"

ফুলী মাথা নাড়িল—"না"—

"মিছা কথা কইস্ না—আমি বুঝি সব"—

ফুলী উত্তর দিল না। নিরুত্তরে সে আকাশের দিকে ক্লান্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিল। ধূলায় ঢাকা কাচের মত আকাশে উত্তপ্ত সূর্য্যালোকের সঙ্গীত।

হারাণ খানিকটা আপনমনেই বলিয়া চলিল, "সব বুঝি—সব বুঝি, কিন্তু কি করুম ক', আমাগোর কপালের দোষ"—

বাতাসের স্রোতে ধূলার ঘূর্ণাবর্ত্ত। দূরে প্রান্তরের শেষ সীমানা কুয়াশায় ঢাকা মনে হয়। ঝড়ের শব্দে যেন সহস্র সহস্র সৈনিকের মত্ত কলরব।

হঠাৎ হারাণ চমকিয়া উঠিল। ফুলী যেন যন্ত্রণায় কাৎরাইল।

"কি হইচে ফুলী ?"

ফুলীর মুখমণ্ডল বেদনায় বিবর্ণ। বায়ুবেগে তাহার মাথার রুক্ষ চুল উড়িতেছে। দূরে মাঠের উপর শুষ্ক তৃণরাশি উড়িতেছে।

"ও ফুলকুমারী—কি হইচে ?" হারাণ আদর করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল। গৃহ নাই, অর্থ নাই, আশা নাই, এই নিরন্ন

পরিবর্তনশীল, ভয়সঙ্কুল যাযাবর জীবনের একটি বন্ধন, একটিমাত্র ঐশ্বর্য্য ঐ ফুলী। হারাণ আদর করিয়া তাহাকে 'ফুলকুমারী' বলিয়া ডাকিতে পারে বৈকি।

ফুলী এতক্ষণে কথা বলিল, জোরে নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "একটু ব্যথা মনে হইত্যাছে"—

"ব্যথা! কিসের ব্যথা?" হারাণ বুঝিতে পারে না।

ফুলী বিশীর্ণ হাসি হাসিল—"আইজ হয়ত"—

হারাণ বুঝিতে পারিল। ভয়ে তাহার মুখমণ্ডল পাংশু হইয়া গেল, মুহূর্ত্তে তাহার বুদ্ধি লোপ পায়।

"তা হইলে কি অইব?" সে ফুলীকেই প্রশ্ন করিল।

ফুলী একটু হাসিল, "কি আবার অইব—আবার উঠ—একটা গাঁওতে পৌছাইতে হইব।"

হারাণ দূরের ধূলিজালে বিলীয়মান বনরেখার দিকে চাহিয়া বলিল —"অই একটা গাঁও—ঐদিকে চল্—কেমন?"

ফুলী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কষ্ট হইব তর্, আমার কান্ধে ভর দিয়া চল্।" হারাণ বলিল।

"না, কেউ দেখ্ব।"

"কেডা দেখ্বরে পাগ্‌লী—কেউ ত' কাছে নাই।"

ফুলী মাথা নাড়িল, "না।"

তাহারা চলিতে লাগিল।

ফুলী চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়ায় আর অনুভব করে যে, তলপেটে একটা ক্ষীণ ব্যথার অন্তরাল হইতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রফলার আঘাতের মত একটা ঊর্দ্ধমুখী জ্বালা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতেছে।

হারাণের ডান পা ছোট। মাটী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া ডানাভাঙ্গা পাখীর মত শূন্যে কয়েকবার পাক খাইয়া হঠাৎ আবার মাটীতে পড়ে। আবার ওঠে।

বৈশাখের রৌদ্রে যেন অসংখ্য সঙীণের নিষ্ঠুর দীপ্তি।

একটা খাল পার হইয়া তাহারা গ্রামটিতে ঢুকিল। গ্রামের নাম নাকি নিশানপুর। গ্রামের এক প্রান্তে যেখানে হাট বসে তাহারই অনতিদূরে তাহারা আস্তানা গাড়িল।

বেলা তখন দুই প্রহর। ফুলীর বেদনা বাড়িয়া চলিয়াছে।

হারাণ দুইটি ইঁট যোগাড় করিয়া আগুন জ্বালাইল। তিন চার মুষ্টি ক্ষুদকুড়া ছিল ময়লা, পাঁচমিশালী। তাহাই ধুইয়া সে টিনের বড় বাটিটায় চাপাইয়া দিল।

ফুলী যন্ত্রণায় ঘামিতেছে। সে বলিল, "থাইক, আমিই রাঁন্ধি"—

হারাণ হাসিল—"হ হইছে, ত'র যে কষ্ট হইত্যাছে আমি বুঝি দেখ্‌ত্যাছি না? আর রাঁন্ধনের আছেই বা কি রে যে কষ্ট হইব আমার" ?—

আজ বোধ হয় হাটবার নয়—তাই ভীড় নাই। মাঝে দু'একজন চালডালের দোকানটিতে আসে। তাহাদের মধ্য হইতেই দু'একজন মাঝে মাঝে তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যায় বেতবনের পার্শ্বস্থিত সরু পথটা ধরিয়া।

অধিকাংশই দরিদ্র, চাষী শ্রেণীর লোক।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাটিটার মধ্যে জল ফুটিতে থাকে টগ্‌বগ্ করিয়া। অর্দ্ধসিদ্ধ ক্ষুদের একটা গন্ধ ঝড়ের পরেরকার স্তিমিত বায়ুতরঙ্গে পাক খাইয়া বেড়ায়। হারাণের শুষ্ক জিহ্বাটা লালায় সিক্ত হইয়া উঠে। ফুলীও একবার তাকায়।

দুই জন লোক আসিতেছিল। অল্পবয়স্ক, একটু বাবু গোছের। আশা হয়।

—"বাবু—দয়া করেন"—হারাণের কণ্ঠ হইতে আপনা হইতেই কথাগুলি বাহির হইয়া আসে।

লোক দুইটি ফিরিয়া চাহিল।

যে লোকটির গায়ে নীলরঙের জামা ছিল, সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

"বাবু—একটা পয়সা দ্যান্ বাবু"—

লোকটি সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিল,—"আরে দ্যাখ্"—

সঙ্গী মাথা নাড়িয়া হাসিল।

তাহাদের চোখে রাত্রি।

"বাবু"—

"কি চাসরে?"

"কিছু খাই নাই বাবু—একটা"—

"পয়সা—না? চুলায় কি সিদ্ধ হইতেছে তবে?"

"একমুঠা ক্ষুদ—কিন্তু মোরা যে দুইজন প্রাণী"—

"হুঁ" লোকটি হঠাৎ ফুলীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "ওটি কে তর্? কইথিকা ফুস্‌লাইয়া আন্‌লি?"—

হারাণের মস্তিষ্কে মুহূর্তে আগুন জলিয়া উঠিল—"তা কইবেন না বাবু—উটি আমার বৌ"—

"ইস্—হালার ত্যাজ দেখ্‌ছস্ রে ছিদাইমা—চল্"—

ছিদাম কি যেন বিড়বিড় করিয়া বলিল। পরক্ষণেই দুইজনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

হারাণ অবরুদ্ধ ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "শালা—শুয়ার"—

ফুলী কাৎরাইতেছে।

"যন্ত্রণা বাড়ত্যাছে নাকিরে—ও ফুলকুমারী"—

"হ। আইজই অইব"—

একটু পরেই ক্ষুদ-সিদ্ধ নামিল।

একটু লবণ মিশ্রিত সেই উত্তপ্ত ও তরল পদার্থের স্পর্শে জিহ্বা যখন শিহরিত হইয়া উঠিল তখন তাহাদের চোখে জল আসে।

কিন্তু হায়, চার পাঁচ গ্রাসের পরেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। পেটের মধ্যে একটা হাহাকার উঠিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। রৌদ্রের তাপ এখন পড়ন্ত। বেতের ডগাগুলি দুলিয়া উঠিতেছে, বাঁশের পাতাগুলি সর্‌সর্ শব্দ করিয়া কি যেন বলিতেছে, দূরে কোথায় যেন একদল ছেলে কোলাহল করিয়া খেলিতেছে। বেলা পড়িয়া আসে।

বিকালবেলায় হারাণ ভিক্ষায় বাহির হইল।

কেহই দিল না। সন্ধ্যার দিকে ভিক্ষা দেওয়া গ্রামের রীতি নহে।

কেবল একটি বাড়ীতে দুই মুষ্টি ধানমিশানো ক্ষুদকুড়া সে পাইল।

সন্ধ্যার পর হইতেই ফুলীর যন্ত্রণা বাড়িল।

বাজারের দিকে ক্রমশঃ নির্জ্জন হইয়া আসিতেছে। কেবল দূরে খালের বাঁকে একটি নৌকা বাঁধা—যাত্রীদের লইয়া মীরপুরগামী সাড়ে আটটার ছোট জাহাজটিতে করিয়া পৌঁছাইয়া দিবে ধলেশ্বরীর তীরবর্ত্তী কলাতিয়ায়। অন্ধকার গাছপালার পাতার আড়ালে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে।

ফুলী গোঙাইতেছে। পশুর অবরুদ্ধ আর্ত্তনাদের মত, তাহা হারাণের কাছে ভয়ঙ্কর মনে হয়।

"ওগো"—

"কি ফুলী ?" হারাণ ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দেয়।

ফুলীর ক্ষীণকণ্ঠ শোনা যায়—"একটু জল গরম কইরো—আর ছুরিটারে একটু আগুণে পোড়াইয়া লও—কাজে লাগবো"—

"আইচ্ছা। এহনই করুম নাকি ?"

"না—একটু পরে"—

অসহ্য যন্ত্রণাকে দাঁতে দাঁত দিয়া চাপিবার চেষ্টা করে ফুলী। তাহার বড় বড় নিঃশ্বাস ভাসিয়া আসে।

ক্রমে চারিদিক আরও নির্জ্জন হইয়া উঠে, হাটে আর কারও কথাবার্ত্তা শোনা যায় না, গয়নার নৌকাটা কয়েকবার হাঁক দিয়া ছাড়িয়া দেয়, খালের জলের ছলাৎছল শব্দ পূবের বাতাসে পাল তুলিয়া চলে, অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা তাহাদের বহু পুরাতন অথচ রহস্যমধুর আবহসঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দেয় আর শুষ্ক পাতার উপর মাঝে মাঝে কি সব পোকা মাকড় চলাচল করায় সর্‌সর্ শব্দ উত্থিত হয়। রাত বাড়ে।

আরও একটু পরে অন্ধকার আবার স্বচ্ছ হইয়া আসিতে থাকে—দূরে পূর্ব্ব দিগন্তে আধফালি চাঁদ দেখা দেয়।

"ওঃ—মাগো—মা"—ফুলীর কান্না শোনা যায়।

হারাণের বুকের ভিতর ধ্বক্ করিয়া উঠিল, ফুলীর সেই কান্নার শব্দে তাহার মাথার ভিতরটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

"কি হইছে গো ? ফুলকুমারী—ও ফুলকুমারী"—

ফুলী সাড়া দিল না!

"ও ফুলকুমারী"—

"আগুণ জ্বালাইয়া জলটা গরম কর এইবার"—

"আইচ্ছা"—

চাঁদের আলো আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে।

হারাণ আগুন জ্বালাইল। আগুনের কম্পিত আলোর রেশ পড়ে ফুলীর মুখের উপর। ঘামে ও যন্ত্রণায় তাহার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

"ওঃ—ওঃ"—দাঁতে দাঁত চাপিয়া ফুলী গোঙায়।

হারাণ দিশাহারা হইয়া উঠে।

হঠাৎ ফুলী উঠিয়া বসিল—হামাগুড়ি দিয়া সে সামনের গাছের আড়ালে যেখানে আলো একটু অস্পষ্ট, সেইখানে গেল।

"ফুলী—কৈ যাস্?" হারাণ ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

"এদিকে আইসো না"— ক্ষীণকণ্ঠে ফুলী উত্তর দিল।

হারাণ আগুণের দিকে চাহিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিল। জলের পাত্রে জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। আকাশের একফালি চাঁদের আলোর সহিত আগুনের আলো মিশিতেছে। ফুলীর যন্ত্রণাকাতর গোঙানির শব্দ মুহুর্মুহু শোনা যায়। গ্রামের রাত নিঃশব্দ।

"উঃ—উঃ"—আর্ত্তনাদ।

হারাণের শরীর কাঁপিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দ।

হঠাৎ একটি শিশুর কান্না শোনা গেল।

"ফুলী"—হারাণ উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় ডাকিল।

"গরম জল আর ছুরি লইয়া আস"—ফুলীর কথা শোনা গেল। যেন কবরের নীচ হইতে কেহ কথা বলিতেছে।

হারাণ ছুটিয়া গেল। আশঙ্কায়, উত্তেজনায়, আগ্রহে ও ভালবাসায় তাহার সারা দেহ কাঁপিতেছে।

"কি ফুলী?"—

রক্ত আর ক্লেদের মাঝে ফুলী পড়িয়া আছে।

"নাড়ীটা কাট"—

হারাণ তাহা কাটিল।

"এই কাপড় দিয়া নাড়ীটা বান্ধ"—

হারাণ বাঁধিল।

"পোলা না ম্যায়া ?"

"পোলা"—

ফুলী আর কথা বলিল না।

"ফুলী—এবার কি করুম ?"

ফুলী উত্তর দিল না।

হারাণ তাহার উপর ঝুঁকিয়া ডাকিল—"ফুলকুমারী"—

ফুলী মূর্চ্ছা গিয়াছে।

কোলের উপর ছেলেটা আবার ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। রক্ত ও ক্লেদাক্ত সজীব মাংসপিণ্ড। তাহার ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন হারাণের হাতের শিরা বাহিয়া তাহার সারাদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্। নূতন জীবনের স্রোতের শব্দ।

হারাণ ছেলেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৫

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই হারাণের ঘুম ভাঙ্গিল। গাছপালার পাতার উপর সুবর্ণের স্পর্শ—চতুর্দ্দিকে গভীর প্রশান্তি। নিজের পারিপার্শ্বিককে হারাণ কতকটা উপলব্ধি করে, ভাল লাগে। কিন্তু সে কতক্ষণ ? একটু পরেই যখন চোখের সামনে সব কিছু আরও পরিষ্কার হইয়া আসিল, যখন বিগত নিদ্রার জড়তা ক্রমে অন্তর্হিত হইল, তখন হারাণ বুঝিল যে, চতুর্দ্দিকের গাছপালার শ্যাম শোভা, সূর্য্যালোকের সুবর্ণ-মদিরা, আর প্রভাত বায়ুর স্রোতে প্রবহমাণ প্রশান্তিই সব কিছু

নয়। তাহাদের অন্তরালে নিরন্তর সংগ্রামশীল জীবনের আর্ত্তনাদ আছে, অভাব আছে, ক্ষুধা আছে।

নিজের জঠরের পীড়াদায়ক শূন্যতা সম্বন্ধে হারাণ সচেতন হইল।

ফুলী নির্জীবের মত ঘুমে অচৈতন্য। রাতারাতি তাহার আকৃতির বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটিয়াছে। কোন প্রেতলোক হইতে যেন সে সবেমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। যন্ত্রণায়, বেদনায় তাহার চক্ষু আরও কোটরগত হইয়াছে, বর্ণ মলিনতর হইয়াছে। বুকের পার্শ্বে সদ্যোজাত ছেলেটা। শীর্ণ, কঙ্কালসার, অসহায় মানব-শিশু—একটি চামচিকার মত ক্ষুদ্র।

হারাণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনটি প্রাণীর ক্ষুধা।

কিন্তু ঘন্টা দুয়েক ধরিয়া সারা গ্রাম ঘুরিয়াও পেট ভরিবার মত সে কিছুই পাইল না। ভিক্ষার পাত্রে দুই মুষ্টি চাল আর তিন চারিটি আলু ছাড়া আর কিছুই পড়িল না।

কিন্তু চাই-ই। কয়েকটা পয়সা, না তো খানিকটা দুধ। ফুলীর দুর্ব্বল শরীর।

একটি অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া সে দাঁড়াইল।

"এক মুঠি ভিক্ষা দ্যান্ গো বাবু"—

কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

"বাবু—দয়া করেন বাবু—ভগমান আপনাদের রাজা কইর্‌বো।"

"কেডারে?" একজন বয়স্ক লোক বাহির হইয়া আসিল। হাতে হুঁকা।

"দয়া করেন বাবু"—

"দয়া! দয়া করণের দিন গেছে গিয়া—আগে বাড়, আগে বাড়"—

"দুইটা পয়সা ছান্ বাবু—আপনাদের ভগবান অনেক দিব।"

লোকটি মুখ বিকৃত করিয়া উত্তপ্তকণ্ঠে বলিল, "আরে থাম বাবা—অনেক দিব না কচু—যাও—যাও"—

"আমার বৌ'এর কাইল রাতে একটি ছেইলা হইছে বাবু—একটু দুধ খাওয়াইতে হইব—বড় কাহিল। ছান্ বাবু—দুইটা পয়সা ছান্ বাবু"—

লোকটি কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া জিহ্বাটা সজোরে তালুদেশে স্পর্শ করিয়া এক অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া বলিল, "ইল্লো—হালার সখ্ দেইখা বাঁচি না। দুধ চাই—দুধ—ক্যান্? তোমার বৌ'এর পোলা হওনের কি দরকারটা ছিল?—যাও—যাও"—

লোকটি ভিতরে চলিয়া গল।

দূর দিগন্তের পারে কোথাও বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন দিগন্ত পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠে তেমনি লোকটির কটূক্তির জ্বালা হারাণের রক্তস্রোতে আগুন জ্বালাইয়া দিল আর সেই আগুনের সর্পশিখার দীপ্তি তাহার ক্ষীণ শিরাগুলি বহিয়া তাহার ঘোলাটে, নিষ্প্রভ চক্ষুতারকাদ্বয়কে ক্ষণকালের জন্য রক্তাভ ও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

ফিরিয়া গিয়া সে ভিক্ষালব্ধ চাল আর আলু দিয়া যাহা রাঁধিল তাহা ফুলীকে জোর করিয়া খাওয়াইল।

খানিকপরে সে ডাকিল—"ফুলী—"

"কি?"

"চলবার পারবি?"

"এহানে কেউ কিচ্ছু দেয় না—চল অন্য গাঁয়ে যাই।"

"এহনি?"

"হ। তোর হয়ত কষ্ট হইব—কিন্তু কি করুম সোনা—ক'?"

ফুলী একবার নিজের দুর্ব্বলতাকে ওজন করিয়া দেখিল, একবার বক্ষলগ্ন ক্ষুদ্রাকার নির্জ্জীব শিশুটিকে দেখিল, পরে বলিল—"চল—"

তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠিতে গিয়া ছেলেটার বুঝি একটু লাগিল, সে কাঁদিয়া উঠিল। অতি ক্ষীণ অতি দুর্ব্বল তাহার কণ্ঠস্বর। যেন কাঁদিতে তাহার সাহস নাই।

হারাণের মুখে হাসি খেলিয়া যায়—ছেলেটার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া বলে, "কান্দ ক্যান্—এ্যাঁ? কান্দ ক্যান গো সোনামাণিক?"

ফুলী ম্লান হাসিয়া ধীরে ধীরে পা বাড়াইল।

হারাণের ডান পা' মাটী ছাড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠে। পরক্ষণেই ছিন্নপক্ষ পাখীর মত মাটীতে পড়ে—আবার উঠে—আবার—

দূরে দিগন্তের ওপারে যে নূতন গ্রাম আছে, সেখানকার মানুষগুলির হয়ত দয়া আছে—সেখানে হয়ত খাদ্য আছে—আঃ চল, তাড়াতাড়ি চল।

নূতন গ্রামের নাম তেতুলঝোরা। গ্রামের দক্ষিণ দিকে ধলেশ্বরী। বৈশাখের বাতাসে তাহার জল তরঙ্গসঙ্কুল।

গ্রামটি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু।

গ্রামের হাটবাজার নদীর তীরেই। তাহারই একপাশে একটা ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপ—অনেকদিন আগে যখন নদী আরও দূরে ছিল তখনকার দিনের। পাকা ভিটা, ধূলা, আবর্জ্জনা আর ঝোপ ঝাড়ে অর্দ্ধ লুক্কায়িত। কিন্তু দরিদ্র ও উদ্দেশ্যহীন পথচারী, ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীরা সেই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে বাস করিয়া পরবর্ত্তী সমগোত্রীদের জন্য বাসোপযোগী স্থান করিয়া রাখিয়াছে।

হারাণ স্ত্রীপুত্র লইয়া সেইখানেই বহির্পার্শ্বে ক্ষণ-নীড় বাঁধিল।

তখন অপরাহ্ন। বাহিরে সূর্য্য-দগ্ধ আকাশ তখনও যেন দর্পণের মত, তাকানো যায় না।

"বড় কষ্ট হইচে, না ফুলকুমারী ?"—হারাণ বসিয়া সস্নেহে বলিল।

ফুলীর মাথা ঝিম্‌ঝিম করিতেছিল। মাথার উপরকার উত্তপ্ত আলো চারিদিকের উত্তপ্ত বাতাস আর দীর্ঘ পথ—ফুলীর দোষ নাই।

তবুও সে হাসিল, এক অদ্ভুত নিরাসক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "না।"

কোলের ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল।

"কান্দে ক্যান্ গো ?" হারাণের পিতৃত্ব সজাগ হইয়া উঠিল।

"ক্ষিদা পাইছে"—বাম স্তনটি ছেলেটার মুখে দিতে দিতে ফুলী উত্তর দিল। তারপরে সে তাহার ক্লান্ত চক্ষু দুইটিকে নিবদ্ধ করিল দূরে—হাটশেষে ধলেশ্বরীর ক্ষুব্ধ জলরাশির ওপারে—ধূলিধূসর তীরভূমির যে অস্পষ্ট রেখা দেখা যাইতেছে—তাহার উপর।

মাঝে মাঝে ফুলকুমারীর এমনই হয়। যখন তাহার দেহ ও মন অনাহারে, পরিশ্রমে দুর্ব্বল হইয়া উঠে, তখন সে মাঝে মাঝে দূরের দিকে তাকায় আর ভাবে। কি ভাবে তাহা কে জানে, কি অদৃশ্য সঙ্কেত-লিপি সে কাহার জন্ম রচনা করে তাহাই বা কে জানে। কেবল মাঝে মাঝে নানা রঙের আমদানি হয় তাহার দৃষ্টির সামনে, নানা হাতের হাতছানি সে দেখিতে পায় দূর দিগন্তের ধূসর সীমা-রেখায়। মাঝে মাঝে ফুলকুমারীর এই হয়।

কাহার যেন কাশির শব্দ শোনা গেল।

হারাণ একটু নড়িয়া উঠিল।

"কোয়ান থিকা আইত্যাছ তোমরা—এঁ্যা ?" কে যেন প্রশ্ন করিল। হারাণ পিছন দিকে ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই, পশ্চাতে বেদীর মত যে উঁচু মাটির ঢিবিটা তাহার অপর পার্শ্বে একটি লোক শুইয়া ছিল। লম্বা চওড়া জোয়ান সে, খাড়া নাক, মাথায় একরাশ ফাঁপিয়া উঠা রুক্ষ চুল, উজ্জ্বল চক্ষু। পরণে

তাহার একটি ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়, দেহে একটি অতিমলিন জামা। বয়স গোটা ত্রিশেক হইবে।

লোকটি হাসিয়া আবার প্রশ্ন করিল, "কোয়ান থিকা আইত্যাছ?"

হারাণের কেমন যেন লোকটিকে পছন্দ হইল না, সে উত্তর দিল, "নিশানপুরের ঐ দিক থিকা।"

"তোমরা ভিখারী?"

"হ'—তাতে কি?" হারাণ তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

"না—কিছু না। আমিও ভিখারী"—লোকটি হাসিল, পরে আবার বলিল, "আমার নাম কিষ্টচরণ, তোমার?"

"হারাণ"—

"ওঃ"—লোকটি এবার ফুলীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে তোমার বৌ বুঝি?"—

"হ"—

ফুলী এতক্ষণে সচেতন হইয়া লোকটির দিকে ফিরিয়া চাহিল। লোকটির ছেঁড়া জামার অন্তরালে তাহার বলিষ্ঠ দেহ দেখা যাইতেছে। যেন পাথর। লোকটী তাহার দিকে চাহিয়া আছে নিষ্পলক ও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে।—সে দৃষ্টিতে একটা বিমুগ্ধভাব আর তাহারি সহিত এক দুর্ণিবার কামনার আবেদন। ফুলীর শরীরে হঠাৎ রোমাঞ্চ খেলিয়া গেল।

হারাণ লোকটির সেই দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। শালা, হারামজাদা, নিজের মনে সে কয়বার বলিল। পরে ঈষৎ ঝাঁঝালো কণ্ঠে ফুলীকে বলিল, "গ্যাখ্ না—ছ্যাম্‌রা ঘুমাইচে নাকি!"

ফুলী হারাণের দিকে ফিরিয়া চাহিল। রুগ্ন হারাণের জীর্ণ শরীর, তাহার ভিক্ষুকের চাহনি।

"তোমাদের সংসার আছে—বেশ—বেশ"—খানিকটা নিজের মনে কিষ্টচরণ বলিল, "আমার কিন্তু হালার কেউ নাই"—

সে একটু থামিল, পরে পকেট হইতে একটা বিড়ি ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া হারাণকে আহ্বান করিল, "বিড়ি খাবা ?"

হারাণ সজোরে মাথা নাড়িল, "না"—। লোকটিকে সে সহ্য করিতে পারিতেছে না।

কিষ্টচরণ একটু হাসিয়া নিজেই বিড়িটি ধরাইল।

দেশলাইয়ের কাঠিটির জলার শব্দে ফুলী আর একবার লোকটির দিকে চাহিল। লোকটিও তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ফুলী মুখ ফিরাইল।

দূরে ধলেশ্বরীর জলে একটা পান্‌সী নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। বৈশাখের বাতাসে তাহার পালের বুক ফুলাইয়া উপরের নিরুদ্দেশযাত্রী মেঘের মত কোথায় যেন সে ভাসিয়া চলিয়াছে।

সেদিন গ্রামের হাটবার।

বিকালবেলা হারাণ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল, ফিরিল সন্ধ্যায়—শূন্যহস্তে। নাই, নাই, দেশে অন্ন নাই। একমুষ্টিও তণ্ডুলকণা নাই, এই কথাটা মনের মধ্যে আলোড়িত হইতেই তাহার পেটের মধ্যে যেন আগুণ আরও তীব্রবেগে জলিয়া উঠিল। একবার সে ফুলীর দিকে চাহিল। ঐ দুর্ব্বলদেহী প্রসূতিকে দেখিয়া তাহার বুক দুঃখে ফুলিয়া উঠিল।

ছেলেটাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ফুলী যেন কি ভাবিতেছে। ফুলীর ভাবনা যেন বাড়িয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান অন্ধকারের পটভূমিতে ফুলীকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। তাহার যেন প্রাণ নাই।

ফুলী মুখ না ফিরাইয়া একবার ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, "কিছু পাইলা ?"

"না"—হারাণ অস্ফুটস্বরে বলিল।

ফুলী আর কিছু বলিল না।

এমন সময় কিষ্টচরণ ফিরিয়া আসিল। তাহার কাঁধে একটি বড় ঝোলা, হাতে একটি লাঠি। সেই লাঠিতে ভর দিয়া সে কষ্টে সৃষ্টে আসিতেছিল। মনে হয় যেন সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

কিন্তু সেই ভগ্ননীড়ের সম্মুখে আসিয়াই সে সহজ পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

তাহাঁদের দিকে চাহিয়া সে হারাণকে বলিল, "কি ভাই কেমন ভিক্ষা পাইলা ?"

হারাণ সে প্রশ্নের জবাব দিল না, লোকটির মিথ্যা অভিনয় দেখিয়া সে হিংসায় অধীর হইয়া বলিল, "বাইরে বুঝি দেখাও যে তোমার বাত-ব্যাধি হইচে ?"

কিষ্টচরণ হাসিল, "হ।"

"ক্যান্ ?"

"তা নইলে কেউ দয়া করব না।"

তাহার নির্লিপ্ত ও সহজ কণ্ঠে হারাণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আমি কালি সবাইরে কইয়া দিমু তোমার জালিয়াতির কথা"—

কিষ্টচরণ নিরুত্তরে ঝোলা ও লাঠিটি একপাশে রাখিয়া বসিল, তাহার পরে একটি বিড়ি বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া তাহা ধরাইয়া বলিল, "কেউ বিশ্বাস কইরবো না—আমার বাম অঙ্গে ছুঁইচ ফুটাও, আগুণের ছ্যাকা দ্যাও, কিচ্ছু হইবো না—স্থাখ্ বা ?" বলিয়াই সে একটি কাঠি জ্বালাইয়া তাহার শিখাটি নিজের বাম হস্তের নীচে

ধরিল। তাহার মুখে একটুও বিকার পরিলক্ষিত হইল না, তাহার দেহ একটুও নড়িল না।

কাঠিটি যখন নিভিয়া গেল, তখন তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কিষ্টচরণ বলিল, "কেউ তোমারে বিশ্বাস কইরবো ? হাঃ হাঃ হাঃ"— উচ্চকণ্ঠে সে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির বেগে তাহার বলিষ্ঠ দেহটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

ফুলী কিষ্টচরণের দিকে চাহিল। তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতেছে।

হঠাৎ হাসি থামাইয়া বিড়িতে এক টান দিয়া ও আর একটি বিড়ি ছেঁড়া জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া কিষ্টচরণ হারাণকে বলিল, "বিড়ি খাবা ভাই ?"

হারাণ হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল, "না—না"—

একটা নিরুপায় ও নিষ্ফল ক্রোধের তরঙ্গ তাহার সারা দেহকে অবশ করিয়া ফেলিল।

কিষ্টচরণ ফুলীর দিকে চাহিল, পরে নিঃশব্দে একবার হাসিয়া ভাটিয়াল সুরে গান শুরু করিল,

"হায় গো হায়, এ আমার কি হইল !
রাজার কন্যার স্বপন দেইখা
চোখের ঘুম যে পালাইল,
এ আমার—কি হইল !"

বেশ গায় কিষ্টচরণ। ফুলী কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। ক্ষুধায়, বেদনায় অবসন্ন স্নায়ুকোষের অন্তরালে তাহার মন কেন যেন বারংবার বলিতে লাগিল যে সে রাজকন্যা আর কেহ নহে—সে ফুলকুমারী, সে ফুলকুমারী।

একটু পরেই কিষ্টচরণের উনুন জ্বলিল।

হারাণের সংসারে এবেলা অনাহার।

কিষ্টচরণ ভাতের হাঁড়ীতে চাল ঢালিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "তোমরা পাক কইরবা না?"

হারাণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "না।"

কিষ্টচরণ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া আবার প্রশ্ন করিল, "ক্যান্?"

কি বেহায়া লোকটা! হারাণ জলিয়া উঠিল, চোখ বড় বড় করিয়া সে বলিল, "আমাগোর খুসী"—

কিষ্টচরণ একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "রাগ ক্যান? আমার কাছে চাইল বেশী আছে—চাইট্টা নাও—না খাইলে পোয়াতী মানুষের কষ্ট হইব।"

হারাণ মুহূর্ত্তে ফাটিয়া পড়িল, "খবরদার—তোমার দরদের ধার ধারি না, তোমার কাছে কিছু চাই নাই, নিমুও না,"—

কিষ্টচরণ হাসিল—"আইচ্ছা ভাই—আইচ্ছা"—

হারাণ চুপ করিল। ফুলী চুপ করিয়াই আছে। বুকের উপর সদ্যোজাত শিশুটি নির্জ্জীবের মত স্তন্যপান করিতেছে। অনাহারে দুর্ব্বল, বেদনায় অবসন্ন দেহের স্বল্প রক্তের সমুদ্র হইতে উত্থিত ক্ষীরধারা পাইয়া সে পরিতৃপ্ত। কিন্তু ফুলী?

রাত বাড়িল। ওপাশে কিষ্টচরণ খাওয়া দাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। ফুলীও শুইয়াছে। কিন্তু হারাণের চোখে আর ঘুম আসে না। থাকিয়া থাকিয়া নিজের পৌরুষের উপর তীব্র ধিক্কারে তাহার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পাশের অভুক্তা প্রসূতির কথা মনে করিয়া তাহার চোখে অন্ধকারে জলের জোয়ার আসে।

রুদ্ধকণ্ঠে সে ডাকিল—"ফুলকুমারী"—

ফুলী কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হারাণের চোখে অবশেষে ঘুম আসিল।

কিন্তু ফুলী জাগিয়াই ছিল। রাত অন্ধকার। আজ চাঁদ দেরীতে

উঠিবে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা, উপরে আকাশের অজস্র চোখের চঞ্চল তারার দুর্ব্বোধ্য ভাষা। চারিদিকের সেই অন্ধকারকে ভেদ করিয়া ফুলীর চোখের তারা কিসের উপর যেন নিবদ্ধ।

ফুলীর চোখে ঘুম আর আসে না। তবু সে চুপ করিয়া পড়িয়াই রহিল।

একটু পরে নিকটেই কোথাও একদল শৃগাল চীৎকার করিয়া উঠিল। দৃশ্য ও অদৃশ্য নিশাচর নিশাচরীদের তাহারা যেন মধ্যরাত্রির সংবাদ জানাইয়া দিল।

ফুলী বুঝিতে পারিল যে, কিষ্টচরণ উঠিয়া বসিয়াছে। সেও ঘুমায় নাই। সে স্পন্দিত হৃদয়ে চক্ষু মেলিল। অন্ধকারের মধ্যে নিজের মিশ্‌কালো চেহারা মিশাইয়া দিয়া কিষ্টচরণ পা টিপিয়া টিপিয়া যেন কোথায় গেল।

কিষ্টচরণের পায়ের চাপে শুষ্ক পত্রের রাশি ধ্বনি তুলিয়া যেন প্রতিবাদ জানাইল। ক্রমে তাহা আবার মিলাইয়া গেল—দূরে —দূরে—

আবার সেই অন্ধকার ও থমথমে রাত। এবার পূর্ব্বের দিক হইতে একটা ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস আসিল। তাহার স্পর্শে চতুঃপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী যেন নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে তাহাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। রাত বাড়ে।

ফুলীর চোখে সবে মাত্র তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময় দূরের একটি কোলাহলের ধ্বনিতে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে শিহরিত করিয়া কাহারা যেন চীৎকার করিতেছে—'চোর—চোর'—।

ফুলী উঠিয়া বসিল। অন্ধকার পাতলা হইয়া আসিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষের আকাশের এক কোণে স্তিমিত দীপের মত এক ফালি চাঁদ।

কাহার দ্রুত পদক্ষেপ শোনা গেল।

পরক্ষণেই একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া সেই ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের অপর পার্শ্বে প্রবেশ করিল।

ফুলী চিনিল সে কিষ্টচরণ। মুহূর্তে নিশীথ রাত্রির পটভূমিকায় নিদ্রোত্থিত ভয়ার্ত্ত গ্রামবাসীদের চীৎকারের কারণ তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

সে মৃদুকণ্ঠে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কেডা?"

আবছা অন্ধকারে তাহার সম্মুখে কিষ্টচরণের দীর্ঘ দেহটা ছায়ামূর্ত্তির মত আবির্ভূত হইল।

উত্তর হইল, "আমি কিষ্টচরণ"—তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে। সে যে অনেকখানি পথ দৌড়াইয়া আসিয়াছে তাহা বোঝা গেল।

"তুমি আমার নাম জান্‌লা ক্যাম্‌নে?"

"আমি জানি।"

ফুলী হাসিয়া বলিল, "চুরী কইরা ফিরলা?"

কিষ্টচরণের হাসি শোনা গেল, সে উত্তর দিল, "হঁ"—

"তুমি চোর?"—অন্ধকারে বিদ্যুতের মত জ্বালাময় হইয়া উঠিল ফুলীর চক্ষু।

কিষ্টচরণ আরও কাছে সরিয়া আসিল, এত কাছে যে তাহার দ্রুত নিঃশ্বাস যেন ফুলী অনুভব করিতে পারে।

দাঁতে দাঁতে চাপিয়া কিষ্টচরণ বলিল, "তুমি ঠাট্টা করত্যাছ বুঝি? হ—আমি চোর—ভালভাবে যখন উপায় হয় না তখন আমি এই করি, ঠিকই করি। এই দুনিয়ায় চোরেরাই চিরদিন বাঁচ্‌ব।"

ফুলী হাসিল, "তুমি রাগ ক্যান্‌?"

কিষ্টচরণ আরও সন্নিকটে আসিল। তাহার দেহের নৈকট্যে ফুলীর সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। সে একবার সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

কিষ্টচরণের কণ্ঠস্বর বদলাইয়া গেল, "তুমি আমার সঙ্গে এত কথা বলত্যাছ! আমার কি ভাইগ্য! হ—আমি চোর—দ্যাখ্‌বা কি আন্‌ছি? গয়না—সোনার গয়না"—এই বলিয়া সে কোমর হইতে একটি পুঁটলী বাহির করিয়া খুলিয়া ধরিল। শীর্ণ চাঁদের বিচ্ছিন্ন ও ম্লান আলোকের স্পর্শে এক রাশ সোনার গহনা ঝক্ ঝক করিয়া উঠিল। ফুলীর দেহ সেই অস্পষ্ট পীতাভ রঙের ছোঁয়াচে যেন অবশ হইয়া আসে।

কিষ্টচরণ বলিল,—"নিবা তুমি? চাই তোমার এগুলি? গয়না নিয়া কি করুম আমি? ফুলকুমারী—আমার কেউ নাই এই পিরথিমীতে—তুমি আমার হও। সোয়ামীর কথা ভাবত্যাছ? বল ত' গলা টিইপা দেই ওরে শেষ কইর‍্যা"—

ফুলী চকিতে স্বামীর দিকে চাহিল। ক্ষুৎ-পিপাসায় নির্জ্জীব হারাণ অতি ক্লান্ত, অতি অসহায়ভাবে শুইয়া আছে। মুহূর্ত্তে সেই অর্দ্ধালোকে, অর্দ্ধান্ধকারে তাহার মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ধূলি-মলিন পথের জীবনেও সংস্কার থাকে—মানুষের সংস্কার। সেই সংস্কার আর স্বুবর্ণের দীপ্তিতে ভাস্বর কামনার দলে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিল।

হঠাৎ ফুলী নিজেকে সচেতন করিয়া তুলিল। ছেলেটা একা পড়িয়া আছে।

সে পা বাড়াইল।

মুহূর্ত্তে কিষ্টচরণ তাহার দক্ষিণ হাত চাপিয়া ধরিল, "ফুলকুমারী—বল—এহনও আন্ধার আছে"—

সেই বলিষ্ঠ হস্তের স্পর্শে রক্তের সমুদ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও সুপ্ত বাড়বানল যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তবুও জোর করিয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া অতি দুর্ব্বলকণ্ঠে ফুলী বলিল, "না—না"—

ছুটিয়া গিয়া সে ছেলেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখ গুজিয়া পড়িয়া রহিল।

কিষ্টচরণ থমকিয়া দাঁড়াইল, পরে বলিল, "ফুলকুমারী—তুমি কি আমারে চিন্‌লা না? কত জনম তোমার স্বপন দেখ্‌চি আমি—ফুলকুমারী"—

ফুলী নিঃশব্দে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কিষ্টচরণ নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল।

সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ ফুলী শুনিল বইকি, তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় বারংবার তাহার প্রতিধ্বনি রচনা করিল। তারপর চোখের সামনে অদৃশ্য যবনিকার উপর নানাবর্ণের নানাছবির মধ্যে বারংবার কতকগুলি গহনা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ভূগর্ভের অন্ধকার হইতে উত্থিত পীতাভ ঐশ্বর্য্য—স্বুবর্ণ।

ঘুম আর আসেনা।

অন্ধকারের যবনিকা সরাইয়া নূতন দিনের সূর্য্য আবার উঠিল।

ক্রমে বেলা বাড়ে।

সূর্য্য যথাসময়ে মধ্যগগনে আরোহণ করিল।

কিন্তু হারাণের জঠরের শূন্যতা একটুও বদলাইল না।

কেহ কিছু দিল না। নাই, নাই, দেশে অন্ন নাই।

ক্লান্তপদে টলিতে টলিতে হারাণ চলে। আর কোনও বাড়ী বাকী নাই। হাতের পাত্রে দুইটি আলু সম্বল।

না, ডোবার ঐ অপর পার্শ্বের বাড়ীটিতে যাওয়া হয় নাই। হারাণ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরের দিকে লোকজন নাই।

হারাণ উঠানের একধারে গিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর মেয়েরা আহারে বসিয়াছে।

সমস্ত জঠর জুড়িয়া কাহারা যেন কলরব করিয়া উঠিল। ভাত, ভাত। গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া মেয়েরা খাইতেছে। ধরণীর বুকের অমৃতরাশি—প্রাণের অজস্র কণিকা।

"মা গো—দয়া কর"—হারাণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল।

মেয়েরা চমকিয়া উঠিল।

"ও মা—ড্যাক্‌রার সাহস দেখত্যাছ! ওরে মাইন্‌কা—তাড়াইয়া দেত' আবাগীর পুত্‌রে"—একটি বৃদ্ধা বলিল।

"কাইল থিকা খাই নাই—একমুঠ ভাত গ্যাও মা গো"—হারাণ কাঁদিয়া বলিল।

ঘর হইতে মাণিক বাহির হইয়া আসিল, আসিয়াই হারাণের গলায় এক ধাক্কা দিয়া বলিল, "বাইর হ'—অন্দরে ঢুকত্যাছ হালা! চোর কোথাকার—দিনে ভিক্ষা, রাইতে চুরী—সব বুঝি বাবা—হ'। কাইলকা যে সাউগো বাড়ীতে চুরী হইছে তার জন্য তোমারেই পুলিশে ধরাইয়া দিমু হালা—বাইর হ"—

আবার পথ।

ডোবার পার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়া হারাণ বসিয়া পড়িল।

অসহ্য ক্ষুধায় তাহার দেহ কাঁপিতেছে। আহা ঐ রক্তাভ অন্নের এক মুষ্টি যদি সে পাইত! তাহার গলনালী বাহিয়া ধীরে ধীরে তাহা তাহার পেটের মধ্যে গিয়া থামিত, তারপরে সেই অন্নরাশি রূপান্তরিত হইত অমৃতে, ছড়াইয়া পড়িত তাহার নির্জীব রক্তকণিকায় আর তাহার সঞ্জীবনী স্পর্শে তাহারা জীবন্ত হইয়া প্রবেশ করিত শিরায় শিরায়, দ্রুতবেগে আবার প্রবাহিত হইত প্রতি উপশিরায়, অস্থিতে, মজ্জাতে—সে বাঁচিত।

হঠাৎ হারাণ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছেলেমানুষের মত। সেই জনবিরল পথের একাংশে সে কান্না কেহ দেখিল না, শুনিল না।

কেবল একবার উপরের দিকে চাহিয়া সে বলিল—"ভগবান"—

অনেকক্ষণ পরে তাহার কান্না থামিল। তবুও সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার নজর পড়িল যে সম্মুখে ডোবাটা কল্‌মীশাকে পরিপূর্ণ। জলে নামিয়া সেই পঙ্কিল জল অঞ্জলি ভরিয়া অনেকখানি পান করিয়া সে একগাদা কল্‌মীশাক ছিঁড়িয়া লইয়া উঠিল।

আবার পথ।

মাতালের মত টলিয়া টলিয়া চলে হারাণ। তাহার খোঁড়া পা'টা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তভাবে শূন্যে ওঠে, আবার মাটীতে পড়ে—শূন্যে ওঠে, আবার—

ফুলী ঝিমাইতেছিল। ক্ষুধাজনিত তন্দ্রার ঘোরে। ছেলেটাও নিদ্রিত।

হারাণ ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ফুলী চক্ষু মেলিল।

"কিছু পাইলা ?"—ফুলীর কণ্ঠে ক্ষুধা।

শাক আর আলু দুইটি মাটীর উপর ফেলিয়া দিয়া হারাণ বলিল, "এই সিদ্ধ কর্"—

ফুলী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হারাণ এদিক ওদিক তাকায়। কিষ্টচরণ নাই।

ফুলী এবার উঠিয়া আগুন জ্বালাইল।

কল্‌মীশাক আর আলু কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধ হইল।

একটু নুন দিয়া তাহাই দুইজনে গিলিল। ক্ষুধাতুর জিহ্বার আর ভালমন্দ জ্ঞান নাই।

হারাণ একটু লজ্জিতকণ্ঠে খানিক পরে বলিল, "বড় কষ্ট হইল, না ফুলকুমারী ?"

চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিল।

ফুলী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "না, কষ্ট হইব ক্যান্? আমি ত' মানুষ না জানোয়ার—কল্মী শাক সে ত' ভাল জিনিষই—তাতে কষ্ট হইব ক্যান্? কি ভাতার রে আমার! ঘাস খাওয়াইয়া বাহাদুরী চায়—আবার আদর কইর‍্যা ডাকে—ফুলকুমারী!" বলিয়াই সে একপাশে বসিয়া সন্থ জাগ্রত ছেলেটাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল—দুগ্ধহীন স্তন।

হারাণ অপরাধী বোধে কি যেন দু'একবার বলিবার চেষ্টা করিল, পরে কি ভাবিয়া চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

একসঙ্গে এতগুলি কথা কিন্তু ফুলকুমারী কোনওদিন বলে নাই।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

বিকালবেলা হারাণ আবার বাহির হইয়াছিল এখনও ফিরে নাই।

চামচিকার মত জীর্ণকায় ছেলেটা ফুলীর কোলে কাঁদে।

সে ধমক্ দেয়, "চুপ্ কর হাড় হাবাইত্যা—চুপ্"—

কিন্তু অসহায় মনুষ্য সন্তানটা কিছু বোঝে না।

"তোমার সোয়ামী বুঝি ভিক্ষায় বাইর হইচে?"

ফুলী ফিরিয়া চাহিল। কিষ্টচরণ। পানের রসে রঞ্জিত দাঁত মেলিয়া সে হাসিয়া প্রশ্ন করিতেছে।

"হু"—নীরসভাবে ফুলী উত্তর দিল।

কিষ্টচরণ ফুলীর উত্তরের ভঙ্গীতে চুপ করিল। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সে বলিল, "সুন্দর"—

ফুলী মুখ না ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"তুমি।"

ফুলী কিষ্টচরণের দিকে চাহিল, "তোমার ফষ্টি নষ্টি আমার ভাল লাগ্‌ত্যাছে না—খবরদার"—

"ফুলকুমারী—তুমি রাগ করচ ?"

ফুলী উত্তর দিল না।

কিষ্টচরণ নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

কিন্তু সে নির্লজ্জ, একটু পরেই আবার বলিল, "আইজ খাইচ ত—এ্যাঁ ?"

"খাই না খাই—তোমার তাতে কি ?"

কিষ্টচরণ কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া বলিল, "একজন মানুষ আর একজন মানুষেরে খাইচে কিনা জিগাইলে কি দোষ হয় ফুলকুমারী ?"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে ফুলী বলিল, "আমার নাম ধইরা তুমি ডাইকো না বুঝ্‌চ ?"

"আইচ্ছা ফুলকুমারী।"

সে নিজের পুঁটলী খুলিয়া এক বাটি চাল লইয়া ফুলীর সামনে রাখিয়া বলিল, "আমি ভিখারী, আমি চোর—কিন্তু আমি মানুষ। মানুষের দুঃখ, ক্ষিদার জ্বালা আমি বুঝি। ফুলকুমারী এই চাইল কয়টা তুমি লও—"

"না"—

" 'না' কইও না—আমার মাথার কিরা।"

ফুলী সম্মুখে রক্ষিত বাটির চালের দিকে চাহিল। চাল। উত্তপ্ত জলের মধ্যে ঐ গুলি ঢালিয়া দিলে ওগুলিও টগ্‌বগ্ করিয়া জলের সহিত ফুটিবে, ক্রমে তাহা নরম হইবে, ফেনের ধারা গড়াইয়া পড়িবে আগুনের উপর, বাতাসে ভাসিবে একটা মৃদু সৌরভ। তারপরে একটু নুনের ছিটা। রসনায় জল আসে ফুলীর।

ফুলী হাত বাড়াইয়া চালের বাটিটা টানিয়া লইল।

দূরে ক্লান্ত হারাণের পায়ের নীচে শুষ্ক পত্ররাশি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে দেখিল যে ফুলীর অত্যন্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া কিষ্টচরণ যেন কি বলিতেছে। ক্ষুধায় অবসন্ন স্নায়ুকোষে অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন আগুনের ঝড় আসিল।

সে ফুলীর নিকটে গিয়া শূন্য পাত্রটি নিক্ষেপ করিয়া পরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হইয়াছে?"

কিষ্টচরণ স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

ফুলী কিষ্টচরণের চালের বাটিটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "কিছু চাইল দিল এই লোকটা—তাই নিলাম"—

হারাণের শরীর ক্রোধে কাঁপে, "ক্যান্ নিলি?"

ফুলী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিছু নাই যে—"

"ইস্লো—নাই বইলা যার তার কাছ থিকা নিবি! বেশ্যা মাগী কোথাকার—না খাইয়া আমি নাই?"

ফুলী সবেগে ঘুরিয়া একবার হারাণের মুখের দিকে চাহিল। হারাণের ক্রোধে বিবর্ণ শীর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে ক্ষণকাল জলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সে আবার মুখ ফিরাইয়া লইল।

হারাণ লাথি মারিয়া চালের বাটিটা দূরে নিক্ষেপ করিল। অজস্র চালের কণা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল আর তাহারই দিকে চাহিয়া নিস্পন্দভাবে ফুলী বসিয়া রহিল। হারাণ সেখানেই থামিল না, অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কিষ্টচরণের নিকটে সে আগাইয়া গেল, "খবরদার শালা—তোমার বদমাইসি কিন্তু আমি সহ্য করুম না"—

কিষ্টচরণ নির্ব্বিকারভাবে বসিয়াছিল, হারাণের দিকে একটু অবজ্ঞাভরে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, চেঁচামেচি না কইরা মাথা ঠাণ্ডা কর, যাও বস গিয়া"—

হারাণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"না, আমি বসুম না—তুই কেরে শালা যে আমারে বস্‌বার হুকুম দিবি ?"

কিষ্টচরণের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল. সে উঠিয়া দাঁড়াইল, "দেখ হারাণ গাইল দিও না"—

"ক্যান্ দিমু না ? আমার বৌয়ের লগে পিরীত করতে আসবি আর কিছু কমু না—হালা শুয়ার-কোঁথাকার"—

মুহূর্তের জন্য কিষ্টচরণের পেশীগুলি কঠিন হইয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই তাহার দক্ষিণ হাতটি উর্দ্ধে উঠিল এবং একটি চড়ে হারাণ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া কিষ্টচরণ বলিল, "চুপ কর্ হতভাগা"—

হারাণ নিশ্চল অবস্থায় বসিয়া রহিল।

ফুলী নিঃশব্দে এতক্ষণ সব দেখিতেছিল, নিঃশব্দেই সে উঠিয়া আসিয়া স্বামীর নিকটে দাঁড়াইল। একবার কিষ্টচরণেব দিকে এক দুর্ব্বোধ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে হারাণকে বলিল, "উঠ"—

হারাণ এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরাইয়া পাইল। ফুলীর দিকে সে চাহিল। তাহার পরাজিত পৌরুষের সমস্ত আক্রোশ এবার হিংস্রভাবে তাহাকে ফুলীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার ফুলীকে পর্য্যবেক্ষণ করিল, শিকারের উপরে লম্ফনোদ্যত বন্য পশুর মত। পরক্ষণেই ফুলীর রুক্ষকেশের রাশি ধরিয়া টানিয়া সে নিজের জায়গার দিকে চলিল।

বেদনায় বিবর্ণ হইয়া ফুলী বলিল, "ছাড়—ছাড়"—

"হ—ছাড়ত্যাছি মাগী—ছাড়ত্যাছি—তোমার পিরীত বাইর কইরা তবে ছাড়ত্যাছি"—

নিষ্ঠুরভাবে, নির্দ্দয়ভাবে, অন্ধের মত, পশুর মত হারাণ ফুলীকে প্রহার করিল। মাটীতে লুটাইয়া, নিঃশব্দে, ধূলিধূসর দেহে ফুলী তাহা

সহ্য করিল। অবশেষে যখন হারাণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সে ফুলীকে ছাড়িয়া একপাশে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার রক্তবর্ণ চোঁখ বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়াছে।

চামচিকার মত শীর্ণ, কুৎসিত মানবকটি কাঁদিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ কাঁদিয়া আবার সে চুপ করিল। কেহ নড়িল না।

কিষ্টচরণ উঠিয়া কোথায় যেন চলিয়া গেল।

সব চুপচাপ।

ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

হারাণ ডাকিল, "ফুলী"—

উত্তর নাই।

"ফুলী মাফ্ কর"—

নিঃশব্দতা।

হারাণ কাঁদিয়া বলিল, "ক্ষিদার যন্ত্রণায় আমি জানোয়ার হইয়া গেছি—আমি তোরে মন্দ ভাবচি—আমায় মাফ্ কর্ ফুলকুমারী"—

ফুলকুমারী উত্তর দিল না।

অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ফুলীর দেহে হাত রাখিয়া হারাণ ডাকিল, "ফুলকুমারী"—

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফুলী উঠিয়া বসিল, যেন কোনও অশুচি বস্তুর স্পর্শ হইতে তাহার দেহকে রক্ষা করিবার জন্য সে হারাণের হাতটা সবেগে ঠেলিয়া দিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "খবরদার—আর আমারে ছুঁইও না"—

হারাণের হাত শিথিল হইয়া গেল, ফুলীর সেই কয়টি কথার মধ্যে যে অপরিসীম ঘৃণা ধ্বনিত হইল তাহার আঘাতে হারাণ যেন পাথর হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ হারাণ চুপ করিয়া একজায়গায় বসিয়া রহিল। রাত

বাড়িতেছে, অন্ধকার গাঢ় হইল। তাহার ক্ষুধায় ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সে শুইয়া পড়িল। ক্রমে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। না ঘুম, না জাগরণ—ক্ষুধার জ্বালায় সৃষ্ট এক গভীর তন্দ্রা।

ফুলী ঘুমায় নাই। সে ঠায় বসিয়া আছে।

ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল।

সে নড়িল না।

ছেলেটা অনেকক্ষণ কাঁদিল, পরে সে ক্লান্ত হইয়া চুপ করিল।

মধ্যরাত্রে গ্রামের মধ্যে আবার সেই আর্ত্ত কোলাহল উঠিল—"চোর—চোর"—

অন্ধকারের স্রোত ঠেলিয়া, দৌড়াইয়া কিষ্টচরণ ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই সে বসিয়া পড়িয়া, অস্ফুটস্বরে কিছুক্ষণ গোঙাইল। তারপরে নিজের পোঁটলাপুঁটলী গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে একবার চারিদিকে কাহাকে যেন সে খুঁজিল, তারপরে রাস্তায় নামিল।

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। কেহ ডাকিতেছে।

"শোন"—

অন্ধকারে একটি নারীমূর্ত্তি টলিতে টলিতে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ফুলকুমারী—তুমি!"

"হঁ"—

"কি চাও?"

"কই যাইত্যাছ তুমি?"

"অন্য কোথাও—আইজ পুলিসেরা খবর পাইচে। আইজও চুরী করতে গেছিলাম, কিছু পাই নাই—আর—একজনের সড়কির ঘায়ে বাঁও হাতটা জখমও হইচে"—

"খুব বেশী লাগচে নাকি ?"

"একটু যন্ত্রণা হইত্যাছে, তবে বেশী কিছু না—আর—ওরকম অনেক ঘা খাইচি, আমি যে দাগী চোর"—কিষ্টচরণ মৃদু হাসিল, "আইচ্ছা ফুলকুমারী—আমি চল্লাম"—

"তুমি যাইবা ? আচ্ছা চল। আমিও তোমার সঙ্গে যামু"—

"কি বলত্যাছ ? তুমিও আস্‌বা ? কিষ্টচরণের কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

"হ"—ফুলী শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল।

"তোমার পোলা—সোয়ামী ?"

"আমার কেউ নাই"—

অন্ধকারে কিষ্টচরণ ফুলীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, তোমারে আমি দ্যাবতার ভাণ্ডার লুইটা আইনা দিমু ফুলকুমারী"—

ফুলী মৃদু হাসিয়া বলিল "তাড়াতাড়ি চল—ওরা জাগ্‌ব"—

"হ—চল"—

ফুলী টলিতে টলিতে চলে।

"তুমি টলত্যাছ ! তোমার কষ্ট হইত্যাছে !" কিষ্টচরণ বলিল।

"না"—

"বাঃ রে—আমি দেখ্‌ত্যাছি যে"—

বলিয়াই কিষ্টচরণ পাজাকোলা করিয়া একটি ছোট মেষশাবকের মত ফুলীকে তুলিয়া লইল।

"তোমার হাতে লাগ্‌ব"—ফুলী বলিল।

"কিচ্ছু হইব না ফুলকুমারী।" কিষ্টচরণ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল।

অন্ধকারে গোঁসাইদের বড় বাড়ীটার পিছন দিয়া, নবীন কুণ্ডুর আড়তের পাশ দিয়া, মাধব মুখ্যুর্যের মস্ত বড় বাগানটা হইয়া, মাঠের মধ্য দিয়া হারাণ ফুলীকে বহন করিয়া ধলেশ্বরীর তীরে গিয়া

পৌঁছাইল। সারা পথে তাহার ক্ষতমুখ নিঃসৃত লাল রক্ত তাহার পদচিহ্নকে রঞ্জিত করিল।

"শোন"—ফুলী ডাকিল।

"কি ?"

"গয়নাগুলি আমারে পরবার দ্যাও"—

"ন্যাও না—সবই তো তোমার ফুলকুমারী"—

কিষ্টচরণ গহনাগুলি খুলিয়া ধরিল।

রাত্রি পশ্চিমের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। নদীর তীরে অন্ধকার একটু পাত্‌লা। গহনাগুলিকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

একে একে সবগুলি গহনা ফুলী পরিল। কোনটা ছোট হয়, কোনটা আলগা হয়—তবুও সে সব পরিল। অন্ধকারে সে নিজেকে দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল বুঝিতে পারিল না। একটু পরেই চাঁদ যখন উঠিবে, তখন হয়ত সে তরঙ্গময় ধলেশ্বরীর জলে নিজের ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রতিবিম্ব দেখিবে। দেখিবে যে সে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে ত দর্পণ নাই।

তীরে তিন চারিটি জেলে ডিঙ্গি বাঁধা ছিল। ঝোলার ভিতর হইতে একটি ছুরি বাহির করিয়া একটির দড়ি কাটিয়া কিষ্টচরণ ডাকিল "আয় ফুলকুমারী"—

ফুলী নৌকাতে উঠিল।

নৌকাতে ঠেলা দিয়া কিষ্টচরণ লাফ দিয়া তাহার উপর চড়িল।

হঠাৎ ছায়াছবির মত খোঁড়া হারাণের শীর্ণ, ক্রন্দনরত মুখ, তাহার রক্তের কণা, অশ্রুকণা হইতে গঠিত, চামচিকার মত অসহায় মানব শিশুটির মুখ ফুলীর চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। মুহূর্তে মস্তিষ্কের ভিতর অনেক স্মৃতির আবর্ত আরম্ভ হইল।

আর্ত্তনাদ করিয়া ফুলী বলিল, "না না, আমারে নামাইয়া ছাও গো—আমারে নামাইয়া ছাও"—

কিষ্টচরণ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চুপ"—ফুলীর দেহ কাঁপিতে লাগিল।

পুঁটলী হইতে একটা খাবারের ঠোঙ্গা বাহির করিয়া ফুলীর পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কিষ্টচরণ আবার বলিল, "এই চাইট্টা খাইয়া লও,—ফুলকুমারী—ও ফুলকুমারী"—

খাদ্য। জীবন। ফুলীর রসনায় জল আসিল, মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হইল, কাঁপুনী থামিল। খাইতে খাইতে নিজের দেহের অলঙ্কারের উপর একবার সে হাত বুলাইল। আছে—সব আছে।

অন্ধকারে ধলেশ্বরীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়া গেল।

শেষরাত্রে হারাণের সেই অবসন্ন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

ছেলেটা কাঁদিতেছে।

হারাণ ডাকিল—"ফুলী"—

কেহ উত্তর দিল না।

"ফুলকুমারী—আর রাগিস্ না—আমারে এবার মাফ্ কর"

কে জবাব দিবে ?

"পোলাটা কান্দে যে—শুনস্ না—ও ফুলী"—

এবারও কোন সাড়া না পাইয়া হারাণ উঠিল।

শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠিয়াছে। সেই আলোতে হারাণ দেখিল যে ফুলী নাই, ছেলেটা একা পড়িয়া কাঁদিতেছে।

"ফুলী"—গভীর আশঙ্কায় হারাণ ডাকিল।

"ফুলী—ও ফুলী—উচ্চকণ্ঠে আবার সে ডাকিল।

এদিক ওদিক ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে সে উপলব্ধি করিল

যে, কিষ্টচরণও নাই। এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত সমস্তার সমাধান হইয়া গেল। ফুলী কিষ্টচরণের সহিত পলাইয়াছে। সেই উপলব্ধিতে হারাণের সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, দেহের সমস্ত রক্ত পলকে মাথায় উঠিয়া আবার নামিয়া আসিল। তাহার চক্ষু দিয়া উষ্ণ জলের বন্যা নামিল।

ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া সে বলিল, "কান্দিস্ না বাপ্, কান্দিস্ না—কাইল থিকা তরে আমিই দুধ খাওয়ামু। তর মা? সে মইরা গেছে"—

সেদিনও কিছু জুটিল না। ছোট ছেলেটাকে দেখিয়াও কাহারও দয়া হইল না। নাই, নাই, দেশে অন্ন নাই।

ছেলেটাকে জল খাওয়াইয়া, নিজেও হারাণ জল খাইল।

মধ্যাহ্নে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। ছেলেটা কেমন যেন নিঃসাড়ের মত।

ক্ষুধায়, দুঃখে, লজ্জায় হারাণ কাঁদে। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়াইত ফুলী পলাইয়াছে। সে স্বামী—অথচ সে তাহাকে খাওয়াইতে পারে নাই। ফুলী কেন পলাইবে না?

বিড় বিড় করিয়া সে বলিল, "ফুলী—ফুলী"—

ক্ষুধায় ঘুম আসে নাই, দেহ দুর্ব্বল, চলিতে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া আসে।

সারা গ্রাম সে ঘুরিয়া বেড়ায়। বুকের উপরে রক্ষিত রক্ত মাংসের ক্ষুদ্র ও জীবন্ত পিণ্ডটার মধ্যে তখনও প্রাণের স্পন্দন্ আছে।

মধ্যাহ্ন।

"এক্ মুঠা ভাত দ্যাও গো বাবা"—

"ভাগ্‌, ভাগ্‌"—

"এই মা-মরা পোলাটারে একটু দুধ ছাও মাগো—দয়া কর"—

"মাফ্‌ কর বাছা—এটা কি দুধের আড়ত নাকি?"

আর সে পারে না।

"বাবু"—একটি বাড়ীর দাওয়ার সম্মুখে সে বসিয়া পড়িল।

দাওয়ার উপরেই বাবু বসিয়াছিল।

"কি চাস?"

"এই পোলাটারে বিক্রি করুম বাবু—এক প্যাট ভাত দেন—আর একটা ট্যাকা।"

হারাণের চক্ষু জ্বলে।

বাবু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "পোলা কিনুম? ক্যান্‌? আবার নিজেরইত পাঁচটা পোলা আছে। আর কিনলেও এই বাঁদরের বাচ্চা কিনুম ক্যান্‌—যা যা—আগে যা"—

রাস্তায় চলিতে চলিতে হারাণ বিড় বিড় করিয়া ছেলেকে বলে, তোর কোনও দাম নাই—হতভাইগা। ঠিকইত—যারে মায়ে ফেইলা যায় তারে কে কিনব—কে কিনব?"

ডানাভাঙ্গা মুমূর্ষু পাখীর মত হারাণের ডান পা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠে—আবার পড়ে।

আর পা চলে না।

ক্ষেতের মাঝখান দিয়া হাটের দিকে অগ্রসর হয় হারাণ।

ছেলেটা বুকের উপর নিঃশব্দে পড়িয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতেছে।

হাটের ঘাটে বড় বড় কয়েকটা মহাজনী নৌকা। তাহাতে একজন খাকী প্যান্ট-পরিহিত কর্ম্মচারী—পাশে দুইজন পুলিশ। নবীন কুণ্ডুর

গোলা হইতে চালের বস্তা বাহির হইতেছে। মজুরেরা নৌকা বোঝাই করিতেছে।

হারাণের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, শুষ্ক কণ্ঠনালী দিয়া কথা বাহির হয় না, "বাবু, একমুঠা চাইল স্থান—মইরা যাইত্যাছি—মা-মরা তিনদিনের এই পোলাটারে দয়া করেন হুজুর"—

"ভাগ্‌ শ্বশুরা"—পুলিশের গর্জ্জন শোনা গেল।

"মইরা গেলাম বাবু", বাঁচান, দোহাই"—

"তবেরে শালে"—পুলিশটি দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল।

সে ধাক্কায় কাঁপিতে কাঁপিতে হারাণ বসিয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্ম সে সব অন্ধকার দেখে।

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া আবার পথ ধরিল। নদীর তীর বাহিয়া সে পথ চলিয়া গিয়াছে দূরে—পূর্ব্ব দিকে।

কর্ম্মচারীটি বলিল, "যত্ত সব আপদ—হ্যাঁরে চৌবে—কয় বস্তা হল?"

"এক্‌শো হো হুজুর"—

নাই, নাই, দেশে অন্ন নাই।

পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। খানিকদূর গিয়াই একটা বড় বাগান।

হারাণ থামিল। আর চলা যায় না।

কোল হইতে ছেলেকে নামাইয়া একটা গাছের নীচে সে শোওয়াইল।

ছেলেটা নড়ে না।

হারাণ তাহার বুকে হাত দিল। অতি ক্ষীণ প্রাণের স্রোতোশব্দ। এখনও বাঁচিয়া আছে।

নদীতে নামিয়া এক বাটি জল লইয়া আসিল হারাণ।

একটু জল ছেলেটার মুখে দিয়া সে বলিল, "খা—খালি জল খাওনের অভ্যাসটা এহন থিকাই শিখ্যা রাখ্"—

ছেলেটার দুই কস্ বাহিয়া সেই জল গড়াইয়া পড়িল। সে গিলিতে পারিল না। শুধু জলের স্পর্শে একবার ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটিকে মেলিল।

তাহাকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ হারাণের মাথা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। দায় ফেলিয়া গিয়াছে তাহার উপরে বেশ্যা মাগীটা। আর সে তাহা বহন করিবে! বটে! হঠাৎ এক দুর্নিবার ক্রোধে তাহার দুর্ব্বল দেহ কঠিন হইয়া উঠিল, চোখের তারায় হিংস্রতার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

দুই হাত বাড়াইয়া সে ছেলেটার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল। অতি সহজে, সেই নরম, অর্দ্ধপরিণত মাংসপিণ্ডের উপর তাহার আঙুলগুলি বসিয়া পড়িল, ছেলেটার মুদিত চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—তারপরে একবার দেহটা একটু কাঁপিয়াই স্থির হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে হাত দুইটি সরাইয়া লইল হারাণ, "মরচস! বেশ হইচে বাঁইচা আর কি করবি রে ব্যাটা?"

ছেলের চোখের দিকে চাহিয়া সে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার বলিল, "ঘুমা বাবা—ঘুমা"—

নদীর তীরের নরম মাটি খুঁড়িয়া সে ছেলেটকে মাটী চাপা দিল।

খানিকক্ষণ সেইখানে স্থিরভাবে বসিয়া সে আবার উঠিল।

কিন্তু কিছুদূর গিয়াই সে আবার ফিরিয়া আসিল। সেই মাটীর ঢিবির উপর কাণ রাখিয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ। তারপরে আবার উঠিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

ঘন জঙ্গলে রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। জঙ্গলটা অতিক্রম করিলেই একটা ক্ষেত, সেটি পার হইলেই নূতন গ্রামে পৌছানো যাইত। কিন্তু আর চলা যায় না।

মাটীর উপর শুইয়া পড়িল হারাণ।

সে রাত্রিও কাটিল।

দিনের আলোতে অতি কষ্টে হাঁটিয়া, হামাগুড়ি দিয়া, অবশেষে মাটীতে গড়াইয়া, জঙ্গলের শেষ সীমানায় সে পৌছাইল। কিন্তু আর চলা যায় না।

দিন কাটিল। আবার সন্ধ্যা হইল।

হারাণ চোখে আর কিছু দেখে না। প্রতি নিঃশ্বাসে তাহার দেহ কাঁপে। ডাঙ্গায় রক্ষিত মাছের মত সে বারংবার মুখব্যাদান করিয়া শ্বাস টানে, বাঁচিতে চায়।

(কিন্তু হারাণ বাঁচিবে না। আবার রাত্রি ঘনাইয়া আসিবে, ভোর হইবে, পরদিন অন্ধকার রাত্রি যখন আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তখন হারাণ মরিবে, আর ক্ষুধিত শৃগালেরা তাহাকে ঘেরাও করিয়া জলসার আয়োজন করিবে। হারাণ মরিবেই। দেশে অন্ন নাই। কিন্তু হারাণের সম্মুখের বিস্তৃত ক্ষেত হয়ত একদিন বর্ষার অজস্র বারিসিঞ্চনে সুস্নিগ্ধ ও সুকোমল হইয়া হরিৎ জীবনের অঙ্কুরে ভরিয়া উঠিবে, আলো ও বাতাস হইতে অমিত জীবনের কণিকা আহরণ করিয়া হয়ত সেগুলি ক্রমে বড় হইবে, ক্রমে পাকিয়া সুবর্ণের মত ঝক্ ঝক্ করিবে, মানুষকে বাঁচাইবে কিন্তু তাহাতে হারাণের কি লাভ? হারাণ সেদিন মাটীতে মিশিয়া যাইবে।)

সীমান্তে সৈনিক চাই।

কল্কি

অবশেষে মেঘান্ধকার রাত্রি শেষ হইল ;

ফুটপাথের উপর—যেখানটায় একটু আচ্ছাদন আছে, সেইখানে তাহারা শুইয়া রাত্রিশেষেরই কামনা করিতেছিল। হয়তো নূতন দিনের আলোতে খাদ্য আসিবে, জীবন বাঁচিবে। হয়তো।

তাহারা শুইয়া ছিল সারি সারি, অসংখ্য—নগ্নগাত্র, অর্দ্ধোলঙ্গ নর ও নারী, শিশু ও বৃদ্ধ—রক্তহীন শুষ্কচর্ম্মে আবৃত জীবন্ত কঙ্কালের সারি। তাহারা শুইয়া ছিল। নিদ্রার জন্য নয়, দুর্ব্বলতার জন্য। ক্ষুধা।

আকাশ ঘোলাটে। বৃষ্টি পড়িতেছে ঝিরঝির করিয়া। মেঘাবৃত সূর্য্যের অস্পষ্ট আলো শহরের বুকের উপর ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে।

তারা সর্ব্বশেষে শুইয়া ছিল। বুকের উপর দেড় বছরের ছেলেটা ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া স্তন্যপান করিতেছে। ডান দিকে ছয় বছরের ছেলে ভোলা, বাম দিকে দশ বছরের মেয়ে দুর্গা।

মা !—ভোলা উঠিয়া বসিল।

ক্ষীণকণ্ঠে তারা প্রশ্ন করিল, কি রে ?

ক্ষিদে পেয়েছে।

তারা চুপ করিয়া রহিল।

মা, ও মা, শুনিস না ক্যানে ? বলছি না, ক্ষিদে পেয়েছে—

দশ বছরের মেয়ে হইলে কি হয়, দুর্গার বুদ্ধি আছে। সে মায়ের নীরবতার কারণ অনুমানে বুঝিতে পারিয়া বলিল, ক্ষিদে পেলেই বা কি রে হতভাগা—বেলা বাড়ুক, ভিক্ষে ক'রে পেলে তবে খেতে পাবি।

না, আমায় খেতে দে মা, শুনছিস না ক্যানে ?

চুপ কর।—দুর্গা ধমক দিল।

তুই চুপ কর্ হারামজাদী।—ভোলা পাল্টা ধমক দিল।

তারা চুপ করিয়াই রহিল। ছেলেমেয়েদের দোষ কি? নিজের জঠরের অভ্যন্তরে যে জ্বালা, যে শূন্যতা পাক খাইয়া খাইয়া নিরন্তর দেহকে দগ্ধ করিতেছে, দুর্বল করিতেছে, তাহা যে কি যন্ত্রণাদায়ক তাহা তারা জানে, আর জানে বলিয়াই চুপ করিয়া থাকা ছাড়া অন্য কোনও উপায় তাহার নাই।

তারা ভোলার দিকে চাহিল। শীর্ণ ভোলা। পেটটা প্লীহায় স্ফীত, বুকের পাঁজরাগুলি বিকটভাবে প্রকট, চোয়ালের হাড় দুইটি উঁচু, লিকলিকে হাত-পা, ময়লা জমিয়া দেহের ময়লা রঙ আরও ময়লা হইয়া উঠিয়াছে, আর পীড়াদায়ক বুভুক্ষার নিষ্ঠুর হুতাশন তাহার দুই চোখের তারায় জলজল করিতেছে। দুর্গার চেহারাও তেমনই।

বুকের উপরে শায়িত ছেলেটার দিকেও তারা চাহিল। শীর্ণ, অতি শীর্ণ ও নগ্ন ছেলেটা। মায়ের শুষ্ক কঙ্কালসার দেহের অবশিষ্ট শোণিত-ধারা তাহার দুগ্ধহীন বক্ষ হইতে শোষণ করায় সে ব্যস্ত। কিন্তু সুবিপুল প্রয়াসে তাহার কোমল, লালাসিক্ত জিহ্বার দ্বারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সে একবিন্দু ক্ষীরধারা পায় না। ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল—ক্ষীণকণ্ঠে।

[পাঠক, এবার ওঠ। বেলা আটটা হয়েছে, এবার নরম বিছানা ছেড়ে ওঠা যেতে পারে, নয় কি ?

[উঠে ব'স। পাশের ঘরে একটি সুডৌল হাতের চুড়ির টুংটাং শব্দ হচ্ছে, সেই সুমধুর শব্দকারিণীকে তো তুমি চেন। তিনি চা তৈরি করছেন।

[তোমার শিয়রে টেবিলের ওপর তোমার চাকর আজকের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'খানা রেখে গেছে (কাগজ পড়তে হয় তো ইংরেজী—

সত্যি)। আজ রবিবার। তুলে নাও। বাঃ, অনেকগুলো ছবি বেরিয়েছে তো আজ। ক্ষুধার্ত নরনারীদের ছবি। সত্যি, ভারী দুঃখের বিষয়। কি যে হচ্ছে আজকাল দেশের। যুদ্ধের জন্য এ অবস্থা, কি করা যেতে পারে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আমরা চাকরি করি; সরকারও দয়ালু—র‍্যাশন দেন; তা ছাড়া আমাদের প্রতিপত্তি আছে। অবশ্য একটু বেগ পেতে হয় বইকি। তবু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

[পাতা ওল্টাও। 'An All-India Disgrace'। ব্যাপার কি? পড়। বাঃ, বেশ লিখেছে তো! এমন লেখা কেবল সায়েবরাই লিখতে পারে। কিন্তু কি জানি! সায়েবরা না বোঝালে আমরা বুঝি না, না?

[পাঠক, সেই সুডৌল হস্তের অধিকারিণী কক্ষে প্রবেশ করেছেন। শিশির-স্নাত পদ্মের মত মুখে মৃদু হাসির রেশ, রাত্রিজাগরণ-খিন্ন ডাগর চোখের কোণে বিদ্যুতের জ্বালা। পাঠক, মুগ্ধ হও। বল, এই যে—সুস্বাগতম্ দেবী। দেবী হেসে বলবেন, ধন্যবাদ দেব। টেবিলের ওপর চায়ের কাপ। বল, এই ছবিগুলো দেখ। তিনি দেখে বলবেন, আহা! বল, সত্যি, বড় দুর্দিন এসে গেছে—চাল ডাল পাওয়া আজকাল যে কি ব্যাপার—উঃ! উত্তরে শুনবে, ঠিক বলেছ, হ্যাঁ, ভাল কথা, মাস শেষ হ'লেই আরও তিন মণ চাল বেশি কিনে রাখ, বুঝলে? মাথা নাড়। আচ্ছা।

[বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। অভ্রের গুঁড়োর মত। একটু একটু বাতাস আছে, অস্পষ্ট আলো। দেহে প্রত্যাখ্যাত তন্দ্রার মদির অনুভূতি, সম্মুখে সুন্দরী নারী, তাঁর চোখে কটাক্ষ, সান্নিধ্যে উষ্ণতা।

[পাঠক, কাগজটা মুড়ে রাখ। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সুবর্ণের মত পীতাভ চা। পান কর। একটা সিগারেট ধরাও।

সিগারেট পুস্তক—ভোরের আর্দ্র বাতাসে সিগারেটের স্তবভিত ধোঁয়া নৃত্যরতা অপ্সরীর সূক্ষ্ম দেহাবরণের মত উড়ে যাক, উড়ে যাক—]

অন্যান্য সকলের কথাবার্ত্তা, কোলাহল তারার কানে ভাসিয়া আসে।

সে কি জল—কি তার গর্জ্জন—উঃ!

চারডি ভাত ছাও গো—চারডি বাসী ভাত—

বাড়ি ঘর সবই ছিল ভাই, সবই ছিল—

কতদিন ভাত খাই নি—কতদিন—

একটুকুন ফ্যানই না হয় দাও গো বাবা, ম'রে গেলাম—

মা খেতে দে।—ভোলা ডাকিল।

তারা নড়ে না, তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছে।

জনতা বাড়িয়া চলিয়াছে।... মহানগরী। মহানগরীর নাগরিকেরা। তাহারা হাসিতেছে, কথা বলিতেছে। তাহাদের জঠরে অন্ন আছে, দেহে রক্ত আছে, তাহারা বাঁচিয়া আছে। এই অজস্র সুস্থ, জীবিত নাগরিকের আশেপাশে তাহারা পড়িয়া আছে। সেই ক্ষুধার্ত্ত নরনারীরা।

ছাও গো বাবু, একমুঠ বাসী ভাত দাও।

তুর্লার বুদ্ধি আছে। সে পথচারীদের প্রতি আবেদন জানায়, চারডি খেতে ছাও বাবা, ম'রে গেলাম গো বাবা।

আরে! লোকটা যে ম'রে গেছে!—কে যেন বলিল।

তারা চাহিয়া দেখিল। দূরে বছর পঞ্চাশের একটি কঙ্কাল মরিয়া কাঠ হইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু উন্মীলিত, দৃষ্টি স্থির, রক্তাভ; প্রাচীন মমির মত তাহার গাল ভাঙা, চামড়া কুঞ্চিত ও শুষ্ক। খোলা মুখের দুই পাশে মাছিরা বসিয়া পরমানন্দে লোকটির অবিনশ্বর আত্মার নশ্বর আধারটিকে লেহন করিতেছে।

আমরাও অমনই মরব।—একজন বলিল।

চারডি খেতে স্তাও গো বাবু, না হয় দুটো পয়সা স্তাও।—দুর্গার গলা শোনা যায়।

উঃ আর পারি না।—কে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল।

[পাঠক! বায়ুসমুদ্র বেয়ে সে ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ আমাদের কানে ভেসে আসতে পারে না। আর কি দরকারই বা তার? তার চেয়ে রেডিওটার সুইচ টিপে দাও। কুমারী সুচরিতা সেন গাইছে। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় তোমার কক্ষ ঝঙ্কৃত হোক। বাঃ!]

কেবল মধুসূদনই লজ্জাহারী নন। ক্ষুধাও লজ্জাহারী। তাই কমলার লজ্জা নাই। শতচ্ছিন্ন শাড়ীটার অন্তরাল হইতে তাহার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়। যৌবনের কঠিন ও কোমল রূপ।

মানুষের চোখ আছে। ভগবান দিয়াছেন। চোখের নিয়ম দেখা। তাই শতসহস্র চোখের অদৃশ্য শায়ক আসিয়া কমলার দেহে বিদ্ধ হয়। কমলার বাঁচিবার আশা আছে।

তারা নিজের পরিধেয়ের প্রতি চাহিল। হাঁটু পর্য্যন্ত একটি ছিন্ন শাড়ী—অতি মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত। তাহাতে লজ্জা-নিবারণ হয় না।

দুর্গাও ভোলার মত অবুঝ হইয়া উঠিয়াছে, মা, আর যে পারি না—

ভিক্ষে চেয়ে স্তাখ্ মা।—তারা শুইয়া শুইয়াই বলিল। তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিয়াছে। আজ ষষ্ঠ দিন যে সে বাঁচিয়া থাকার উপযুক্ত কিছু খায় নাই। আজ পনেরো দিন যাবৎ সে অন্নের মুখ দেখে নাই।

বাবুমশয় গো, দয়া করেন, চারডি খেতে স্তান বাবু।—ভোলা বলিল। দুর্গা ভোলার কথা শেষ করে, ভগবান আপনাকে রাজা করবে, চারডি ভাত স্তাও গো বাবু। বাবুরা উত্তর দেয় না।

আকাশে মেঘ পাতলা হইয়া আসিয়াছে। রৌদ্র দেখা দিয়াছে। রাজপথ জনাকীর্ণ। একটি বছর ছয়েকের অতিশীর্ণ ও নগ্ন মেয়ে

ফুটপাতের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। শব্দহীন কান্না। শব্দ করিয়া কাঁদিবার মত তাহার ক্ষমতা নাই। সরু কাঠের ফালির মত লিকলিকে হাত-পা, কেশহীন মস্তকে একটি দগদগে ঘা। হাত নাড়িয়া মাঝে মাঝে পথচারীদের সে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে। বুঝিয়াও কেহ বোঝে না। এই বিপুল পৃথিবীতে মেয়েটির কেহ নাই। তাহার মা-বাপ তাহাকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে, সে তাহা জানে না। হাত-পা নাড়িয়া মেয়েটি খাইতে চায়।

ক্ষিদেয় ম'রে গেলাম, বাঁচাও গো।—দুর্গা বলিল।

এই যে, ঠিক জায়গায় পৌঁছেছি।—একজন যুবক বলিল।

যুবকটির সঙ্গী কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা খুলিয়া ছবি তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তাড়াতাড়ি কর্ রে রমেশ; আবার মেঘলা হ'ল ব'লে।

হ্যাঁ, এই যে।

ক্লিক।

চারিটি ছবি তোলা হইল।

[পাঠক! কালকের 'স্টেট্স্‌ম্যান' বা 'আনন্দবাজার' কিনো। ওই ছবিগুলো তাতে দেখতে পাবে। সেগুলো দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'আহা' ব'লে আমরা আমাদের ঔদার্য্য প্রকাশের সুযোগ পাব, কেমন?]

[এই যে তোমার একজন বন্ধু এসেছেন। বসাও। বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হোক। কমিউনিজ্‌ম ভাল, না ক্যাপিট্যালিজ্‌ম? রাশিয়ার জয় হ'লে কি হবে? ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা হতে পারে। খাদ্য-সমস্যার বিষয়টাও গুরুতর বটে। আলোচনা জ'মে উঠুক।]

পটল আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। মুহূর্ত্তে তাহার মস্তিষ্কের

ভিতরটা অন্তর্দাহী অগ্নির স্থচীমুখী জ্বালার তাড়নায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। আর পারা যায় না। সে উঠিয়া বসিল।

পূবদিক হইতে একটি মোটর আসিতেছে। সে এক পাশে দাঁড়াইল।

মোটরটি যেমনই নিকটস্থ হইল, অমনিই সে লাফাইয়া পড়িল তাহার সামনে। ড্রাইভার বড় কৌশলী। মুহূর্তে সে ব্রেক কষিয়া সজোরে গাড়ি ডান দিকে ঘুরাইয়া দিল। পটল ছিটকাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

রক্ত। হৈচৈ। ভিড়। পুলিস।

মাথায় জল ঢালাতে রক্ত থামিল। পটল জ্ঞান ফিরিয়া পাইল। মোটরের বাবুরা তাহাকে মোটরে চড়াইয়া হাসপাতালে লইয়া চলিল।

পটল মরিল না।

ক্রোধে, দুঃখে সে নিজের মনে বলিল, যদি একবার ভগবানকে পেতাম। কিন্তু ভগবান রসিক লোক। তাঁহাকে পাওয়ার রাস্তা তিনি অনেক ভাবিয়া বন্ধ রাখিয়াছেন।

তারা সব দেখিল। কোলের মৃক শিশুটিকে সে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার বুকের ভিতর দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ সজোরে উত্তেজিতভাবে চলিতেছে।

দুর্গা সমানে ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া চলিয়াছে, দয়া ক'রে চারডি খেতে গ্যাও গো বাবুরা, চারডি গ্যাও—

ভোলা কাঁদিয়া বলিল, কিছু পাচ্ছি না যে মা, অ্যাই মা!

পাবি বাবা, পাবি।—তারা উত্তর দিল।

ছাই পাব, কলা পাব, দে, আমায় খেতে দে।

চুপ কর্ বাবা।

না, চুপ করব না।—সে সহসা দাঁড়াইয়া নিজের পেটের উপর দুই

হাত দিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে কাঁদিয়া বলিল, না, খেতে দে, আমায় খেতে দে রাক্কুসী, শিগগির খেতে দে।

তারা হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কথা খুঁজিয়া পায় না।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক থমকিয়া দাঁড়াইল, পকেট হইতে একটি আনি বাহির করিয়া ভোলার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এই নে বাবা।

ভোলা চিলের মত ছোঁ মারিয়া সেই আনিটা উঠাইয়া লইয়া ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল। পরক্ষণেই সে দৌড় দিল, যত জোরে পারে।

দুর্গা চীৎকার করিয়া উঠিল, থাম্, ওরে ভোলা, থাম্ ভাই।

ভোলা ততক্ষণে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

দুর্গা কাঁদিয়া উঠিল, রাক্কস, রাক্কুসীর পেটের রাক্কস।

চুপ কর্ বাছা, তোকেও দেবে 'খন।

ছাই দেবে, কচু দেবে, ও-সব খেয়ে ফেলবে। ও রাক্কস মরবে, নিশ্চয় মরবে।

দুর্গা!—তারা ধমক দিল।

দুর্গার দুই ভাঙা গাল বহিয়া অশ্রু নামিল, মুখ ফিরাইয়া সে আবার বলিতে লাগিল, দয়া কর, বাবু গো, চারডি ভাত গ্যাও, চারডি খেতে গ্যাও—

বেলা বাড়িতেছে। আকাশ আবার মেঘলা। বৃষ্টি আবার পড়িতেছে। রাস্তায় জনতা, শব্দ, কোলাহল, হাসি। দূরে কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে সারি বাঁধিয়া অগণন নর-নারী দাঁড়াইয়া আছে। বেলা বারোটায় দোকান খুলিবে। সেই পঞ্চাশ বছরের লোকটির শবদেহ তেমনই পড়িয়া আছে। মাছিগুলি তাহার মুখের লালা লেহন করিয়া এবার তাহার চোখের তারার উপর বসিয়াছে।

[পাঠক ! আজ রবিবার, আজ একটু ভাল খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করেছ তো ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের প্রতিপত্তি আছে। তোমার

সেই ডেপুটি বন্ধুটিকে চাল আর তেলের ব্যবস্থাটা ক'রে দেবার জন্তে কাল একবার ব'লো। আর যদি প্রমথ দারোগার সঙ্গেও দেখা করতে পার তো ভাল হয়। সত্যি, ঈশ্বর আছেন ব'লেই আমরা খেয়ে বেঁচে আছি। তা না হ'লে কি হ'ত? আমি কল্পনা ক'রে অনেকবার ভয় পেয়েছি। যদি রাস্তার ওই সব গরিবগুলোর মত তোমার অবস্থা হ'ত, তা হ'লে? তোমার ওই মসৃণ চামড়া শুকিয়ে কুঁকড়ে যেত, গালটা মাংসহীন হয়ে যেত, চোখ দুটো বড় বড় হ'ত, ভেতরের হাড়গুলো মাথা ঠেলে আত্মপ্রকাশ করত, তিলে তিলে ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তুমি প্রতি মুহূর্তে এগোতে। ভয় হচ্ছে বুঝি? তবে থাক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার আমার সে অবস্থা নয়। ঈশ্বর পরম দয়ালু।

[বাঃ, বাইরে কি ঘনঘটা! মেঘের ছায়ায় চারিদিক আবরিত, আকাশের বাঁধন ভেঙে সঙ্গীতের সৃষ্টি ক'রে বর্ষার জলধারা পড়ছে, অবিরাম পড়ছে, মনটা কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতে চায়, না?

[রান্নাঘর থেকে মাংসের গন্ধটা ভেসে আসছে বোধ হয়?

[পাঠক! তোমার দেবী এসেছেন।

[ব'স, নমিতা, ব'স।

[কেন?

[একটা গান গাও।

[দূর, আমার রান্না শেষ হয় নি।

[সে বামুন দেখবে 'খন, ব'স, একটা গান গাও।

[কি গাইব?

['এমন দিনে তারে বলা যায়।'

[গান হোক।

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।

[পাঠক! গভীর অনুরাগভরে সুকণ্ঠী গায়িকার একটি উচ্চ ও সুকোমল হাত নিজের হাতে টেনে নাও। সমাজ সংসার সব মিছে, বাইরের অন্ধকারে তা মিশে যাক, মিলিয়ে যাক।]

দয়া করিবার মত কেহ নাই! দুর্গার গলা ধরিয়া আসিয়াছে, সে মাকে বলিল, আর পারছি না, কেউ তো কিছু দেয় না মা।

তারা ভাবিতে চেষ্টা করে যে, আর কি নূতন কথা বলিয়া সে মেয়েকে সান্ত্বনা দিবে। এমন সময়ে ভোলা ফিরিয়া আসিল। দুর্গা তাহাকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, দে ভাই চারডি, কি এনেছিস।

ভোলার চোখের তারায় প্রাণের অতি ম্লান জ্যোতি, সে বলিল, কিছু আনি নি তো।

দুর্গা বিশ্বাস করিল না, যাঃ, দে না ভাই, লক্ষ্মীটি।

চার পয়সায় কর্টা ফুলুরী মিলবে রে হারামজাদী?

আনিস নি কিছু?

না।

দুর্গা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল, পাজী, গাধা, রাক্কস, সব খেয়ে ফেলেছিস? মা, ও মা, শুনছিস? আমার জন্যে কিছু আনে নি। হারামজাদা।

গাল দিস না দিদি।

ইস! দেব না, একশো বার দেব, মুখপোড়া শুয়োরের বাচ্চা।—বলিয়াই দুর্গা দুম করিয়া ভোলার পিঠে এক কিল বসাইয়া দিল। পরমুহূর্তেই ভোলা হিংস্র জন্তুর মত বোনের চুলের মুঠি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোকে খুন ক'রে ফেলব রাক্কুসী।

মা, মেরে ফেললে আমায়, ও মা!

তারা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া ছেলেমেয়েদের ছাড়াইয়া দিতে গেল। কিন্তু কেহ ছাড়ে না। অতিকষ্টে তাহাদের থামাইয়া সে বলিল, তোদের পায়ে পড়ি, থাম, থাম।

বাঃ রে, আমায় কিছু দিলে না, আর আমি ছেড়ে দেব? আমি যে ম'রে যাচ্ছি, সেটা দেখিস না?

তারা কাঁদিয়া ফেলিল, দেখছি বই কি, কি করবি মা, ভগবানকে ডাক্।

ভগবান? দুর্গা ভগবানের নাম শুনিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে ডাকার কোনও সার্থকতা আছে কি না, তাহা তো সে আজও উপলব্ধি করে নাই।

দুর্গা রাস্তার দিকে আবার মুখ ফিরাইয়া বসিল, তাহার চোখে অশ্রুর ধারা। অনুনাসিক সুরে সে বলিতে লাগিল, ম'রে গেলাম গো, চারডি খেতে দাও, একমুঠো ভাত দাও গো বাবুরা।

শুধু দুর্গা নহে, সেখানে তাহাদের মত আর যাহারা ছিল, তাহারাও দুর্গার মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা করিতেছিল।

অজস্র লোকের মিছিল চলিয়াছে। ট্রাম, বাস, রিকৃশা, মোটর। বড় বড় অট্টালিকা আর ঐশ্বর্য্য। উপরে দুইটি বোমারু বিমান বায়ু-তরঙ্গে বড় বড় ঢেউ তুলিয়া সশব্দে চলিয়া গেল।

ঝিরঝির, ঝিরঝির বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু পূবের আকাশে আবার ঘনকৃষ্ণ মেঘের পুঞ্জ পাহাড়ের মত মাথা ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে নর-নারীর সারি দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে। বৃষ্টিতে, কাদায় তাহারা ভিজিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবুও কেহ নড়ে না। তাহাদের কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে।

শুনছ তোমরা?—ছাতা মাথায় একজন বাঙালী ও একজন মাড়োয়ারী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাঙালীটি বলিল, তোমরা সকলে আগরওয়ালাবাবুর মোড়ের ওই বড় বাড়ীতে চল, ওখানে খেতে দেবে।

দমকা বাতাসে যেন শুষ্ক মৃত পত্ররাশি মর্ম্মরধ্বনি তুলিল।

মাড়োয়ারীটি ডাকিল, দের ক'রো না, এস শিগগিরি ক'রে।

ছেলেমেয়েদের ডাক দিয়া দ্রুতকণ্ঠে তারা বলিল, শিগগির চল্, শিগগির চল্ রে।

চল মা।—ভোলা লাফাইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি চল মা।—দুর্গাও প্রতিধ্বনি তুলিল।

তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। পা দুইটি একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে একবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। প্রাণপণে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে দ্রুতপদে চলিতেও আরম্ভ করিয়াছে। আসন্ন খাদ্যের আশায় তাহারা হঠাৎ জোরে জোরে কথা বলিতেছে, জোরে জোরে পা ফেলিতেছে। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।

কেবল পড়িয়া রহিল সেই পঞ্চাশ বছরের লোকটার শীতল দেহ।

আরও দুইটি প্রাণী পড়িয়া রহিল। একজন বৃদ্ধা। চটের মত মোটা একটা নোংরা কাপড় কোমরে জড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই সম্মুখে একটি বছর পঁয়ত্রিশের লোক ফুটপাতের এক পাশে হাত পা ছড়াইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে লোকটি চক্ষু মেলিতেছিল আর মুখব্যাদন করিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস লইতেছিল।

যাহারা খাদ্যের লোভে ছুটিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন লোক পিছন ফিরিয়া ডাকিল, এই বুড়ী, তোরা যাবি নি?

বুড়ী মাথা নাড়িল।

ক্যানে?

বুড়ী শায়িত লোকটিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইল।

কি হয়েছে ?

মরছে।

লোকটি ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া প্রশ্ন করিল, উটি তোর কে ?

বুড়ী হাসিয়া বলিল, আমার ছেলে, দশ মাস ওকে আমি পেটে ধরেছিলাম।

লোকটি দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

[পাঠিকা ! মেঘমেদুর মধ্যাহ্নের অপরূপ সৌন্দর্য্য কি তুমি দেখবে না ? বাতায়ন খুলে দাও। অভ্রের গুঁড়োর মত বৃষ্টি পড়ছে, ঝিরঝির ঝিরঝির। বাঃ ! অলস দেহ এলিয়ে দাও শুভ্র শয্যার ওপর। বাতায়ন-পথ দিয়ে দূরে চাও। তোমার সুন্দর মুখের ওপর বায়ুতাড়িত অলকগুচ্ছ বারংবার এসে পড়ুক, কালো চোখে স্বপ্ন ঘনাক।

[নিজের সংসারের কথা একবার ভাব। সব আছে। তুমি সুখী। পাশে তোমার চার বছরের মোমের পুতুল, তোমার স্বামীর বুকের মানিক, তোমার ছেলে। তার দিকে একবার সস্নেহে তাকাও। একদিন ও বড় হবে, বিলেত যাবে, আই. সি. এস. হবে, না ? নিশ্চয়ই।

[পাঠিকা ! আজ বিকেলে তোমায় রিহার্সালে যেতে হবে। দেশের দুঃস্থ নরনারীদের সাহায্যের জন্ম চ্যারিটি হবে, না ? তোমার কৃতিত্ব যে এতে অনেক, তা আমি জানি। তুমিই মেয়েদের গান শেখাবে, নাচ শেখাবে। পাঠিকা, তুমি যে দেশের নর-নারীর দুঃখ সহ্য করতে পার না, তা আমি জানি। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

[আঃ ধোঁয়ার মত পাতলা মেঘ আকাশে উড়ে যাচ্ছে—উড়ে যাচ্ছে।]

বৃষ্টিতে ভিজিয়া, অতি কষ্টে ছেলেমেয়েদের লইয়া তারা পৌঁছাইল। তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে। আর শক্তি নাই।

সামনের দিকে চাহিয়া তারা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

ক্ষুৎকাতর জনসমুদ্রের উন্মত্ততা। ঠেলাঠেলি, মারামারি, আর্ত্তনাদ, গালিগালাজ। সবাই আগে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, তাহারা পশ্চাতে বসিয়া আছে। তারাও ছেলে-মেয়েদের লইয়া বসিল।

দুর্গা কাঁদিয়া বলিল, চল্ না মা, এগিয়ে চল্ না।

ভোলা হাত ধরিয়া টানিল, চল্ না এক পাশ দিয়ে মা।

তারা মাথা নাড়িল, ম'রে যাব মা, তার চেয়ে এমনই থাক, না হয় একটু দেরিতে পাব।

দুর্গা কাঁদিয়া বলিল, সব যে ফুরিয়ে যাবে মা, শিগগির চল্।

তারা আর মাথা খাড়া রাখিতে পারে না, সে শুইয়া পড়িয়া বলিল, পাগলী কোথাকার, ডেকে নিয়ে এল যে!

বৃষ্টিতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে।

দুই ঘণ্টা পরে। মাড়োয়ারীর বাড়ির ফটক বন্ধ হইল। অনেক অভুক্ত নর-নারী তখনও অবশিষ্ট। এত ভিড় প্রত্যাশা করা যায় নাই।

অভুক্তেরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

পূর্ব্বোক্ত বাঙালী বাবুটি ফটকের ওপাশ হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, আজ সব ফুরিয়ে গেছে, তোমরা কাল এসো।

অভুক্তদের কোলাহল বাড়িয়া গেল। কিন্তু ফটকটা আর খুলিল না। লোহার ফটক, ভাঙাও যায় না।

কাল? তারা বিশীর্ণ হাসি হাসিল। কাল? সে তো অনেক দেরী, অ-নে-ক দূর।

দুর্গা মায়ের হাত ধরিয়া টান দিল, ও মা, ফুরিয়ে গেল যে!

তারা উত্তর দিল না।

দুর্গা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখনই তো তোকে বললাম, তুই শুনলি না। তুই রাক্ষুসী, না খাইয়ে তুই আমায় মেরে ফেলতে চাস।

ভোলাও কাঁদিতেছে, মা খেতে দে, খেতে দে।

দুর্গা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, মর্, মর্ মুখপোড়া, চার পয়সার ফুলুরি খেয়েও তোর পেট ভরে নি?

ভোলা রুখিয়া উঠিল, গাল দিস না, খবরদার, পেত্নী কোথাকার।

পরক্ষণেই ভাইবোনে মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। কোলের ছেলেটাও কাঁদিতেছে। ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ ক্রন্দন। তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

আয়, মারামারি করিস না, লক্ষ্মীরা, আয়, দেখি কি পাই।

ছেলেমেয়েদের ছাড়াইতে তাহার দম বন্ধ হইয়া আসে।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচাইয়া দুর্গা ভেঙচাইল, কচু-কচু, কচু পাবে।

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে দুর্গা ভিক্ষা চায়, এক মুঠো ভাত দ্যাও গো, ম'রে গেলাম।

দুটো পয়সা দ্যাও বাবু, দয়া কর।—ভোলাও বলে।

তারা একটি গলিতে প্রবেশ করিল। দূরে একটি ডাস্টবিন দেখা গেল। দুর্গা ও ভোলা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সেই দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জ্জনার স্তূপ সরাইয়া সরাইয়া তারা একটি ছাইমাটি-লাগানো শুষ্ক রুটি ও ভোজনশেষে পরিত্যক্ত শালপাতা পাইল। শালপাতায় কয়েকটি ভাত লাগিয়া আছে। দুর্গা মায়ের হাত হইতে রুটিটি কাড়িয়া লইল। ভোলা সেই শালপাতা পরম আগ্রহে লেহন করিতে লাগিল।

দূরে একটি হৃষ্টপুষ্ট দেশী কুকুর শুইয়া আছে। সে নির্লিপ্তভাবে তাহাদের দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ওই খাদ্যে তাহার লোভ নাই।

ছিন্ন শাড়ীর প্রান্ত দিয়া রুটিটি মুছিয়া দুর্গা তাহা ছিঁড়িয়া নিজে একটু বেশি লইয়া ভোলাকে কমটুকু দিল।

ভোলার কণ্ঠে অনুযোগ ধ্বনিত হইল, আমায় এত কম দিলি যে?

দুর্গা ফোঁস করিয়া উঠিল, এই যে দিয়েছি এই তোর বাপের ভাগ্যি, তুই আমায় ফুলুরি দিয়েছিলি রে রাক্কস?

মা, ভাল হবে না কিন্তু।

থাম্, ওরে, থাম্, এবার ফিরে চ বড় রাস্তায়, ইদিকে কিস্ পাব না।

তারার দেহে আর শক্তি নাই।

দুর্গা আর ভোলা সেই রুটির টুকরা চিবাইতেছে। বন্যপশু-শাবকের মত ধারালো তাহাদের দাঁত, ক্ষুধায় তাহার ধার আরও বাড়িয়াছে। হউক না রুটি শুষ্ক কঠিন, তাহারা খাইবেই।

গলির শেষের বাড়িটার দোরগোড়ায় গিয়া দুর্গা ডাকিল, কে আছ গো, দয়া কর, ম'রে গেল্লম গো মা।

একটি বৃদ্ধা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাদের দেখিয়া বোধ হয় বিচলিত হইল। সে ডাকিল, দিদি, ও নীলুদি!

একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

কি ঠাকমা?

কিছু যদি থাকে তো এনে দে তো।

বা: রে, তুমি ঠাকমা সব্বাইকে দয়া করতে আরম্ভ করলে আমরা কিন্তু মারা পড়ব, বাড়িতে কিচ্ছু নেই।

দেখ্ দিদি, লক্ষ্মীটি।

মেয়েটি ভিতরে গেল। খানিক পরে একটি বাটিতে কয়েকমুষ্টি ডালভাত সে লইয়া আসিল। দুর্গা তাহাদের বাটিটা আগাইয়া দিল। বাটিতে পড়িতেই ভোলা আর দুর্গা তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে করিতে পথে নামিল।

ঠাকমা, ভেতরে এস।

চল্ বাছা।

দরজা বন্ধ হইল।

খাদ্য লইয়া দুই ভাইবোনে আবার মারামারি আরম্ভ করিয়াছে। তারা তাহাদের মধ্যে গিয়া জোর করিয়া আধমুঠি কাড়িয়া লইয়া বুকের ছেলেটার মুখে দিল। ছেলেটা তাহা গিলিল। ছেলেটাকে খাওয়াইতে আর ভোলা ও দুর্গার খাওয়া দেখিতে দেখিতে তারার রসনায় জল আসিল। ভাত! আঃ! সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, দুগগা, মা, ক্যামন লাগছে রে? দুর্গার কানে সে কথা গেল না।

ওরে, শুনছিস তোরা, আমায় চারডি দিবি?—তারার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল।

মায়ের ভিক্ষা কেহ শুনিল না।

[পাঠক! আজ সন্ধ্যায় মেট্রোতে ভাল ছবি আছে। তা ছাড়া দু-একজনের সঙ্গে দেখাও তোমাদের করতে হবে। গৃহিণীকে রূপসজ্জা করতে বল।

[পাঠিকা! এবার বৃষ্টি থেমেছে, আকাশ পরিষ্কার হতে চলেছে, সময় হয়েছে। এবার ওঠ। চ্যারিটি শো'র রিহার্সাল। ড্রাইভারকে ডেকে মোটর বার করতে বল। তারপরে দর্পণের সামনে যাও। দর্পণে তোমার সুঠাম দেহের প্রতিচ্ছবি। তোমার দর্পণ তোমার অন্ধ স্তাবক নয়। সে বলছে, তুমি বড় সুন্দর শুনছ? তোমার দীর্ঘ কেশকে আঁচড়ে ঠিক ক'রে তোমার কুন্দশুভ্র মুখমণ্ডলে, তোমার রক্তিম গালে বিলিতী পাউডার আর ক্রীম লাগাও। তোমার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠুক। ভয় নেই, তোমার ও রক্তিম গাল অনাহারে ব'সে যাবে না, তোমার চোয়ালের হাড় দুটো অনশনক্লিষ্ট দেহের দৈন্য জানাতে মাথা ঠেলে উঠবে না। তোমার সৌন্দর্য

অম্লান। তোমার ভয় নেই। ভয় তাদের, যারা দারিদ্র্য-পাপে পাপী।

[পাঠিকা! যদি আমার কথায় নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়, যদি তোমার মনে হয় যে, আমি অভদ্র, আমায় ক্ষমা ক'রো]

আবার সেই ফুটপাথ।

তারা শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার সারা দেহ অবশ হইয়া আসিয়াছে।

ফুটপাথ জলে কাদায় একাকার, তাহাদের পরিধেয় সিক্ত। কোলের ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। তারা নিঃশব্দে ছেলেটার মুখে একটি বিশুষ্ক স্তন গুঁজিয়া দিল। ছেলেটা গভীর আগ্রহে তাহা চুষিতে লাগল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কোনও ফল না পাইয়া সে আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

অতি ক্ষীণকণ্ঠে তারা ডাকিল, দুগগা!

কি মা?

বাটিতে ক'রে একটু জল নিয়ে এসে এটাকে খাওয়া।

আচ্ছা মা।

ভোলা ভিক্ষা চাহিতেছে, দুটো খেতে দ্যাও গো বাবুরা, রাজাবাবুরা, আর যে পারিছি না।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। রাস্তায় ভিড়। সুবেশ নর-নারী, যুবক-যুবতী। ট্রামে বাসে অজস্র যাত্রী। হাসি। কোলাহল।

দূরে সিনেমার বাহিরে বড় ভিড়। আজ একটি নূতন ছবি দেখানো হইবে।

বাতাসে বিলাসীদের দেহসৌরভ আর সিগারেটের ধোঁয়া।

তারা ভাবে। ক্ষুধায় অবসন্ন, নির্জ্জীব চেতনার সমুদ্র হইতে অতীতের ভাঙা জাহাজটা ভাসিয়া উঠিতেছে। ছবির মত গ্রামের

বুকে একটি কুটীর ছিল, জোয়ান স্বামী ছিল, ক্ষেতে ধান ছিল—ছিল, ছিল সবই ছিল।

[পাঠিকা! সবাই এসেছে তো? মিস দাস, মঞ্জু, অমিতা, চিত্রা, সুজাতা, মিঃ সরকার, মিঃ সেন, ললিত, অশোক, ফাল্গুনী এবং আর সকলে? হ্যাঁ, তারা এসেছে। তারা আলোচনা করছে। যুদ্ধের অতি-আধুনিক অবস্থা কি? বাংলা দেশের এই দুর্দশার জন্য দায়ী কে? (মিঃ সেন পি, এইচ-ডি, নয়?) চ্যারিটিতে কত টাকা উঠতে পারে? লাইট আর ড্রেসের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে তো? ফার্স্ট এম্পায়ারে, না গ্লোবে? কোথায় হবে?

[পাঠিকা! তুমি আলোচনার অবসান করাও। যন্ত্রশিল্পীরা বৃত্তাকারে বসুক। মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে সেতার ও সরোদ ঝঙ্কার তুলুক। অমিতাকে ডেকে তুমি সামনে দাঁড় করাও। তুমি তাকে শেখাও—উর্বশী-নৃত্য। দক্ষিণ পদ শ্লথভাবে বাম পদের পার্শ্বে রাখ, দক্ষিণ হস্তে পতাকা-মুদ্রায় নৃত্যের সূচনা হোক। গ্রীবা বাম পার্শ্বে নত ক'রে, বাম হস্তের আলপদ্ম-মুদ্রায় তুমি তোমার অনন্ত যৌবনের ইঙ্গিত দাও,—তোমার আকর্ণ-বিভ্রান্ত নিমীলিত নেত্রের কোণে দেবজয়ী কটাক্ষের জ্বালা বহ্নিমান হয়ে উঠুক। উর্বশীর নূপুর-নিক্বণে বিমুগ্ধ সুরসভা ঝঙ্কৃত হোক। নৃত্য হোক তবে।]

সেই লোকটি মরিয়াছে। তাহার বৃদ্ধা মাতা তাহার শিয়রে নিঃশব্দে শুইয়া আছে। কমলার বাপ প্রশ্ন করিল, তোমার ছেলে এখন ক্যামন?

বুড়ী তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, ম'রে গেছে।

তারা স্তিমিত ঝাপসা দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতেছিল যে, রাস্তার ওপারের ফুটপাথে একটি লোক রাঁধিতেছে।

ভোলা ভিক্ষা চাহিতেছে, দুটো পয়সা দাও গো বাবু, দুটো পয়সাই দাও।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভীতা মহানগরী আলো জ্বালিবে না।

[পাঠিকা! তোমার নৃত্য অপূর্ব্ব! আলোলিত মস্তকে প্রকম্পিত গ্রীবাদেশকে পরিবাহিত কর। উভয় হস্তের শিখর ও চন্দ্রকলা মুদ্রাকে মৃগশীর্ষে রূপান্তরিত ক'রে বিপরীত বাহুর উপর প্রতি হস্ত স্থাপন কর। তোমার কালো চোখের আগুন মহেন্দ্রের বজ্রকেও তুচ্ছ করে। উর্ব্বশী, তোমাকে জয় করার মত অস্ত্র কন্দর্পের তূণীরেও নেই।

[মৃদঙ্গ ধ্বনিত হোক, তোমার নৃত্যরত দেহের গতিতে বায়ু স্তব্ধ-গতি। পাঠিকা! তোমার নৃত্য অপূর্ব্ব!]

নিঃশব্দপদচারী শ্বাপদের মত রাত্রি আসিল।

রাত্রি গভীর হয়। কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে।

আবার বৃষ্টি পড়িতেছে। যানবাহনের চলাচল কমিয়াছে। কাহারা যেন ফিসফিস করিয়া কথা বলিতেছে! অন্ধকারে, পথের মাঝখানে আসিয়া মেয়েরা দাঁড়াইয়াছে। অন্ধকারে চিনিবে না, সুতরাং লজ্জা নাই। তাহারা অপেক্ষা করে। প্রতিটি পথচারীকে তাহারা ডাকে। যদি একমুষ্টি অন্নলাভ হয়, কে জানে!

অন্ধকারে ফুটপাথ হইতে অনেক পুরুষ উঠিয়া দাঁড়ায়। গলি বাহিয়া দিনের আলোতে দেখা বাড়ির দেওয়াল টপকাইয়া তাহারা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে।

মাঝে মাঝে চীৎকার ভাসিয়া আসে, চোর—চোর। পুলিসের হুইসল।

একটি লোক আসিয়া কমলার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

এই, ভাত খাবি?—লোকটি হাসিল।

দাও দাও, চারডি দাও গো।—সকলে কলরব করিয়া উঠিল।

দুর্গা মাকে ঠেলা দিল, মা, খেতে দে, ওমা!

ভোলা হঠাৎ বমি করিতে আরম্ভ করিল।

লোকটি ডাকিল, আমার সঙ্গে আয়।

কমলার মা ফিসফিস করিয়া বলিল, যা না হতভাগী।

কমলা বাপের মুখের দিকে চাহিল। বাপ বলিল, যা।

কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ফুটপাথে তাহারা পড়িয়া থাকে। অজস্র নরনারী। একদল নরনারী রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। পরদিন কন্ট্রোলে অল্প দামে যদি কিছু চাল নুন পাওয়া যায় তাহারই জন্য। কিন্তু। একদিন ওরাও এই ফুটপাথে আসিয়া শয়ন করিবে।

ভোলা বমি করিতে করিতে কাঁদিতেছিল।

দুর্গা ডাকিল, মা, মা গো, দেখ্ না-ভোলা ক্যামন করছে।

তারা কথা বলিতে পারে না। বক্ষলগ্ন ছোট ছেলেটি তন্দ্রাচ্ছন্ন।

পূবের বাতাস বহিতেছে। শীত বোধ হয়।

ভোলা রাস্তার একপাশে গিয়া মলত্যাগ করিতে বসিল।

কালো আকাশে কালো মেঘ। বৃষ্টি পড়ে।

পুলিসের বুটের শব্দ। খট খট খট খট।

দুর্গা ডাকিল, মা, শুনছিস না ক্যানে? দেখ, ভোলা ক্যামন করছে।

ভোলা মায়ের পাশে গড়াইয়া হাঁপায়, কথা বলিতে পারে না।

[পাঠক-পাঠিকা! ঘুমোবার সময় হয়েছে।]

রাত্রি বাড়ে। কমলা ফিরিয়া আসে। তাহার হাতে একটি শালপাতার ঠোঙায় ভাত ও তরকারি।

এনেছিস? ভাত এনেছিস? তাহার বাপ-মা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

হ্যাঁ।

দে, আমায় দে।

বাঃ রে, গতর খাটিয়ে আনলাম, আমি খাব না?

কমলা বসিয়া গোগ্রাসে ভাত গিলিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বাপমাও সেই ভাতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, দে, দে, চারডি খেতে দে মা।

ভাত। তারার অবশ চেতনায় যেন তড়িৎস্পর্শ হইল। দুর্গা তন্দ্রামগ্না। ভোলার জ্ঞান নাই। কলেরার শেষ অবস্থা।

তারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া, হামাগুঁড়ি দিয়া কমলার পিছনে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দিকে একটি হাত প্রসারিত করিয়া সে বলিতে চাহিল, আমায় একমুঠো দাও। কিন্তু পারিল না। কমলার বাপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, যা যা, মাগী, এখানে ভাত কোথায় রে?

তারা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া সে আবার হামাগুঁড়ি দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল; অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

ছোট ছেলেটার ঘুম ভাঙিয়াছে। সে কাঁদিয়া উঠিল। চোখে আর তারা দেখিতে পায় না। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সে ছেলেটাকে বুকে টানিয়া লইল। মনে পড়ে—গৃহ, স্বামী, সবুজ ধানের ক্ষেত, তারার সংসার। তারা একবার মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া কি যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। তাহার জীবনীশক্তি আর নাই। আবার হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সে ভোলার দেহে হাত রাখিল। ভোলার নিস্পন্দ দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা। তারা ছেলেকে ডাকিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

রাত্রি আরও বাড়ে। তারার নিশ্বাস টানা বন্ধ হইল। ছোট

ছেলেটা কিন্তু পরম যত্নের সহিত শীর্ণদেহী মায়ের শুষ্ক, রসহীন স্তন শোষণ করিতে থাকে।

[পাঠক-পাঠিকা! ঘুম আসছে না? শুভরাত্রি। তোমরা ঘুমোও।

[আমারও ঘুম আসছে। কিন্তু আমি তো ঘুমোতে পারব না। নিদ্রায় জাগরণে সদাসর্বদা আমি আজকাল একটা দুঃস্বপ্ন দেখি। আমার ভয় হয় যে কল্কির পালা শুরু হতে আর দেরী নেই। মনে হয় সব ধ্বংস ভ্রংশ হয়ে ছড়িয়ে যাবে চারদিকে।—ধ্বংস হবে আমারই সম্মুখে, এই মুহূর্তে।

[তোমরা ঘুমোও, সমস্ত জাতি ঘুমোচ্ছে; কেন ঘুমোবে না? কিন্তু আমি তো ঘুমোতে পারছি না। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড বজ্রের আঘাত হেনে তোমাদেরও ঘুম ভাঙিয়ে দিই।—আমার চোখে ঘুম নেই—তোমাদেরও ঘুম হরণ করি।

[কিন্তু পারছি কৈ? অতএব তোমরা ঘুমোও, কোনো ভয় নেই।

[কিন্তু বল, আমি কি করে ঘুমোব?]

বাঁকা তলোয়ার

তিনটি প্রাণী। স্বামী স্ত্রী আর একটি বছর চারেকের মেয়ে।

উহাদের দেখিলে ভয় করে। মানুষের মতই হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, মুখ আছে—কিন্তু তবুও মানুষ নয় যেন। মাটীর গর্তান্তরালের কোনও প্রেতলোক হইতে যেন কোনও অদৃশ্য আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের ফলে উহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে। অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান অগ্নিশিখার মত জ্বালাময়ী ক্ষুধার সর্ব্বগ্রাসী ছায়া উহাদের চোখে, অতি প্রাচীন মন্দিরের মত শুষ্ক কালো ও অস্থিচর্ম্মসার উহাদের দেহ।

দিনকয়েক আগে গ্রামেতে একটি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছিল। কয়েকদিন উহারা একপ্রকার তরল ও স্বাদহীন দিব্যবস্তুর স্বাদও গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে দ্রব্য দেবতাদের ভাগ্যেও বোধ হয় বিরল, তাই বেশীদিন তাহারা আর তাহা পাইল না। গ্রামেতে খাদ্য নাই, খাদক আছে, প্রাণ নাই, মৃত্যু আছে। তাই মহানগরীর রাজপথকে উহারা ধন্য করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু মহানগরীর রাজপথ ত' গ্রামের পথ নয়। গ্রামের পথ মাটির। মাটির প্রাণ আছে, তাহাতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরোদ্গম হয়; মাটির প্রাণরসে সে অঙ্কুর সঞ্জীবিত হয়। মহানগরীর রাজপথ প্রস্তর নির্মিত। সেখানে প্রাণ কই? উহাদের ক্ষুধার জ্বালা সেইজন্য কমিল না, সহস্র-মুখ বৃশ্চিকের দংশন জ্বালার মত তাই নিরন্তর উহাদের শূন্য জঠরের মর্মকোষ অনাহারের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল।

অভ্যাস নাই তাই ঠিকভাবে ভিক্ষা করিতে পারে না। ফুটপাথে বসিয়া বসিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া উহারা শুধু চারিদিকে তাকায়, মেয়েটা কাঁদে।

তিনদিন পর।

স্ত্রীলোকটি বলিল "ওগো আর ত' পারি না।

কোলের মেয়েটা নির্জ্জীবের মত পড়িয়া আছে।

পুরুষটি প্রশ্ন করিল, "কি করব এঁ্যা?"

"চাও, ভাল করে ভিক্ষে চাও।"—

"আচ্ছা।"—

মহানগরীর জনসমুদ্রে জোয়ার আসিয়াছে। সেই জোয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই শূন্য করতলকে প্রসারিত করিয়া লোকটি ভিক্ষা চায়।

"দয়া করুন বাবু—মরে গেলাম বাবু।"

স্ত্রীলোকটি কোলের মেয়েটির দিকে তাকায়। শেষ সম্বল। মনে পড়ে—আরো দুইটি সন্তান ছিল। ছয় বছরের একটি ছেলে আর সাত বছরের একটি মেয়ে। মেয়েটি কুখাদ্য খাইয়া কলেরায় মারা গিয়াছে। আর ছেলে—

"এই কোলের মেয়েটার দিকে তাকান—দয়া করুন গো বাবু, দয়া করুন।"

স্ত্রীলোকটি ভাবে। দিন সাতেক আগেকার কথা। সহরে আসার সময় একটি গ্রামের বাগানের ধারের পথের উপর সে স্বামী, পুত্র আর মেয়েকে লইয়া শুইয়াছিল। ছেলেটা অনাহারে অচৈতন্যের মত এক পাশে পড়িয়াছিল। মাঝ রাতে একদল শিয়ালের চীৎকারে একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দূরে অন্ধকারে তাহারা কি যেন কামড়াকামড়ি করিয়া খাইতেছিল। ভোর হইলে জানা গেল যে, শিয়ালদের সেই খাদ্য আর কিছু নয়, আর কেহ নয়—তাহাদের ছেলে।

স্ত্রীলোকটি কাঁদে। শক্তিহীনের শব্দহীন কান্না।

"মরে গেলাম গো বাবু—একমুঠো খেতে দিন—একমুঠো"—লোকটি বলিয়া চলিয়াছে।

জনসমুদ্রে জোয়ার আসিয়াছে—তাহার গতিরোধ করা কি সহজ ?

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উঠছিস ক্যানে ?"

"চল—"

"কোথায় ?"

"বাঁচার চেষ্টা করতে—এই মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে—নাও, ওঠ।"—

"চল্"—হঠাৎ লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল "তুই কানছিস ?"

"হ্যাঁ।"—

নভোচারী বিমানের চক্রধ্বনিতে উপরের আকাশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

অক্ষয়বাবু একটু আগে পূজা আহ্নিক সারিয়াছেন। বাহিরের ঘরে খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তিনি চা'য়ের কাপে চুমুক দিতেছিলেন। এমন সময় দ্বারপ্রান্তে তিনটি ক্ষুধার্ত্ত-প্রেতের মুখ দেখা গেল।

"কি চাই এখেনে, এঁ্যা! যা—যা।"

লোকটি বলিল—"একমুঠো খেতে দিন্ বাবু মরে—" সে কথা আর শেষ করতে পারিল না।

সেই পুরাতন কথা।

অক্ষয়বাবু খেঁকাইয়া উঠিলেন, "তা মরলে আমি কি করব হ্যাঁ, এঁ্যা? আমি কি দানছত্তর খুলেছি না দরিদ্রনারায়ণকে খাওয়াবার ভার নিয়েছি? যা বেরিয়ে যা এখেন থেকে—" লোকটি আর কথা খুঁজিয়া পায় না।

এইবার স্ত্রীলোকটি আগাইয়া আসিল, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা—" স্ত্রীলোকটির কণ্ঠে যেন কি ছিল তাই ওই 'বাবা' শব্দটি এমন মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ শোনাইল যে, অক্ষয়বাবু হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

"বাবা; আপনাদের বাড়ীতে দাসী চাকর হয়ে থাকব আমরা—আমাদের বাঁচান।" অক্ষয়বাবু তাহাদের দিকে চাহিলেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে এইবার সহজে পুণ্য সঞ্চয়ে একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

তিনি ডাকিলেন—"ওগো শুনছ, ওগো।"—

হেমাঙ্গিনী দেবী ডাক শুনিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, "কি বলছ?"

"তুমি না বলেছিলে তোমার শরীরটা আজকাল একটু খারাপ

যাচ্ছে, তাছাড়া বাড়ীর কাজ কর্ম্মও ত' আছে—রেখার ছেলেমেয়ে-গুলো আর রাজুটাকে দেখাশোনা করার জন্যও তো লোক চাই। তুমি একা পেরে উঠবে কেন? এঁ্যা?"

ভুরু কুঁচকাইয়া সন্দিগ্ধভাবে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "ব্যাপারটা কি?"

"একজন লোক রাখ না কেন, মাইনে অল্পস্বল্পই দেবে, কি বলিস বাছা? রাজী?"

স্ত্রীলোকটি যেন প্রাণ পাইল, তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া দ্রুতকণ্ঠে সে বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবা।"

হেমাঙ্গিনী তাহাদের দিকে তাকাইলেন, "ওমা! এই এদের রাখব আমি—এই একপাল। এদের খাওয়াতে হলে যে আমি পথে দাঁড়াব গো।"

স্ত্রীলোকটি করুণ কণ্ঠে বলিল, "না মা, আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকেই রাখুন, আপনি আমাদের বাঁচান।"

"হ্যাঁ, একজনকে রাখব আর বাকী সব?"

"আমাদের মধ্যে একজন একটা চাকরী যোগাড় করে নেবে, আর এটিত বাচ্চা মা।"—

"আমায় আর শেখাতে হবে না বাছা হ্যাঃ—বলি বাচ্চারা কি খেতে জানে না? একজনকে ত' রাখব, আর একজনের চাকরী না হওয়া পর্য্যন্ত কি হবে?"

"ওই একজনের খাবারই সবাই ভাগ করে খাবো মা"—স্ত্রীলোকটির কণ্ঠে মিনতি।

অক্ষয়বাবুও বলিলেন, "রাখো গো জিতুর মা, বাইরের ঘরটাতে ওরা পড়ে থাকবে খন—আহা। বড় মায়া হচ্ছে।"

"হয়েছে হয়েছে—আমাদের যেন পাথরের মন। কিন্তু রাখবে কাকে?"

"লোকটাকে!"

হেমাঙ্গিনী নাক সিটকাইলেন। লোকটির চেহারা শুষ্ক ও রসহীন আমড়ার আঁঠির মত—শিরাবহুল ও চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল। মাথায় তাহার ঝাঁকড়া ঝাকড়া চুল আর সারা মুখে একটা পশুর মত লোলুপতা।

"তোর নাম কিরে?" হেমাঙ্গিনী ধমকাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

"এজ্ঞে—মাণিক"—লোকটির কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা রেকর্ডের শব্দের মত।

"ইস্—মা-ণি-ক—মাণিক না বলে জন্তু বল্লেই শোনাত ভাল।

অক্ষয়বাবু উদারভাবব্যঞ্জক হাসি হাসিলেন।

হেমাঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকাইলেন।

মেয়েটির বয়স বোধ হয় বছর চব্বিশেক। চরম অভাব ও নিদারুণ অনাহারেও তাহার শ্যামবর্ণ মুখের অন্তরালে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কমনীয়তা, মাদকতা লুক্কায়িত আছে—মনকে তাহা নাড়া দেয়।

"আর তোর নাম কি?"

"পার্ব্বতী।"

"তুই-ই কাজ করবি বাছা। তোর জন্তুটি যেন দু'একদিনের ভেতরেই কাজ বাগিয়ে নেয়, বুঝলি? মাইনেটাইনে কিন্তু এখন পাবি না বাপু। একজনকে খাওয়াতে চল্লিশটি করে টাকা লাগে, তা জানিস?"

পার্ব্বতী ঘাড় নাড়িল। "হ্যাঁ।"

মনে পড়ে। একটুকরা মাটির উপর তাহাদের একটি চালাঘর। ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে মাটির প্রাঙ্গণ, তরিতরকারীর বাগান, মাচার উপর লাউ গাছের সবুজ পাতার সমারোহ। ছেলেমেয়েদের কলরব, শ্বশুরের হাসি, স্বামীর মুখের যাত্রা দলের গান। ছোট্ট সংসারের সর্ব্বত্র চঞ্চলা লক্ষ্মী অঞ্চল উড়াইয়া বেড়াইত। হায়—!

(পার্ব্বতী, তোমার সেই দিনগুলি কোথায় গেল?)

অক্ষয়বাবুর সংসারটি বৃহৎ। দুই বড় ছেলে, তাহাদের বৌ, ছোট ছেলেরা, মেয়ে, নাতিনাতনী, স্ত্রী—সব মিলিয়া জনদশেক। ছেলেরা বাজার করে, মেয়েরা গৃহকর্ম্ম করে, তাই সামর্থ্য থাকিলেও আজকালকার বাজারের কথা ভাবিয়া কোনও চাকর রাখা হয় নাই।

মাণিক কাজকর্ম্মের খোঁজে বাহিরে গিয়াছে। কাজ অনেক। মেয়েটাকে কোলে লইয়া দুর্ব্বল শরীরে কাজ করিতে করিতে পার্ব্বতীর মাথা ঘোরে দেহ কাঁপে।

হেমাঙ্গিনী ঝঙ্কার তুলিয়া বলিলেন, "মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে কাজ কর্ না বাপু—ভাত জোটে না যার, তার এত আদর কেন?"

পার্ব্বতী মেয়েকে উঠানে নামাইয়া দিল, "একটু বসে থাক্ মা—এখুনি আসছি, কেমন?"

মেয়েটা বোঝে না। অনাহারের অগ্নিজ্বালা উহাকেও দগ্ধ করিয়াছে, সে জ্বালা হইতে মাই যে ওকে রক্ষা করিতেছে সেটা সে কেমন করিয়া যেন উপলব্ধি করিয়াছে, তাই মাকে ও এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে চায় না।

মাটিতে নামাইতেই মেয়েটি আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। সমস্ত শক্তি দিয়া, গলার নীল শিরাগুলিকে স্ফীত করিয়া সে কাঁদে। ওইটুকু দেহে অতটা শব্দ যে কোথায় লুকাইয়াছিল তাহা ভাবিতে আশ্চর্য্য লাগে।

"না মা, কাঁদে না—থাম—থাম,—লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।"

তবু মেয়েটা থামে না।

হেমাঙ্গিনীর সাত বছরের ছোট ছেলে রাজু একটি নাসপাতিতে কামড় দিতে দিতে মেয়েটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, "এই খবরদার—কাঁদিসনি—এই—!"

মেয়েটা আরও জোরে কাঁদে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "ধন্যি মেয়ে বাবা, কি গলাটাই করেছে— উঃ! নে বাপু, তুই কাজ কর্‌গে। আমার বাড়ীতে মেয়ে কাঁখে নিয়ে কাজ করা চলবে না—।"

পার্ব্বতী নিঃশব্দে কাজ করিয়া চলিল।

মেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মাটির উপরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা আড়াইটা নাগাদ একটি লোহার থালায় কয়েক মুষ্টি কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত ও একটু ডাল লইয়া পার্ব্বতী বাহিরে ছোট্ট নোঙরা ঘরটায় গেল।

মাণিক মেয়েকে কোলে লইয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়াছিল, পার্ব্বতীকে দেখিয়া নড়িয়া উঠিল। ভাত-! সঞ্জীবনী রসের বুদ্বুদ!

"ওমা—ও টুনু—ওঠ্ মা, নে, খা।"

মেয়েকে জাগাইয়া পরম যত্নের সহিত পার্ব্বতী তাহাকে খাওয়াইল। মেয়েটা গোগ্রাসে পরম উৎসাহের সহিত প্রতিটি গ্রাস গিলিল।

"কেমন লাগছে মা—এঁ্যা?" মাণিকের জিহ্বা লালায় সিক্ত হইয়া উঠিল।

"আঁ"—মেয়েটা উত্তর দিল। ভাল লাগে, ভাল লাগে।

"তাই বলি, তুই এখেনে! আমি ভাবনু গেল কোথায় মাগী?" দ্বারপ্রান্তে হেমাঙ্গিনী আসিয়া উঁকি মারিলেন।

"কি মা?"

"তুই বুঝি খাবার এনে ওদের খাওয়াচ্ছিস, এসব চলবে না বাপু, আমি তিনজনকে পুষতে পারব না, বুঝলি?"

"না মা—আপনি যা দেবেন তাই তিনজনে খাব—বেশী চাইব না মা।"—

"হ্যাঁ, মনে রেখো।"

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন।

"নাও—খাও"—পার্ব্বতী স্বামীকে ডাকিল।

"তুই ?"

"খাচ্ছি—তুমি আগে খাও।"

মাণিক একগ্রাস মুখে তুলিল। তাহার চর্ব্বণরত মুখে পরিতৃপ্তির ছায়া ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া পার্ব্বতীর চোখে জল আসিল।

"নে"—মাণিক এক গ্রাস তাহার মুখের সামনে ধরিল।

"না।"—

"আমার মাথার দিব্যি—খা।"—

পার্ব্বতী কাঁদিয়া ফেলিল।

"আবার কানছিস্ ?"

"হ্যাঁ।"

মনে পড়ে। ক্ষেতের ধানের মিষ্টিভাত, মাছের তরকারী, একটু দুধ, এসবের অভাব কোনও দিন ছিল না। পূজা পার্ব্বণে অতিরিক্তের ব্যবস্থা দু'একজন আত্মীয় বন্ধুরাও তাহাদের বাড়ীতে কতদিন খাইয়াছে। তাহার শ্বশুর তাহাকে ডাকিত, 'অন্নপূর্ণা' বলিয়া। (অন্নপূর্ণা, আজ তোমায় কে অন্ন দিবে ?)

তিনদিন পর।

সামনেরই একটি বাড়ীতে মাণিক চাকুরী পাইল। ভদ্রলোক রিটায়ার্ড জজ। ফলে পার্ব্বতীর কাজ বাড়িল। স্বামী থাকিলে মেয়েটাকে তবু কোলে লইয়া থাকিত, এখন তাহাকেই রাখিতে হইবে। মেয়েটা কোল ছাড়া থাকিতে চায় না। মাটিকে ওর ভীষণ ভয়, স্থলের জীব যেমন জলকে ভয় করে।

তবু উপায় নাই। মেয়েটাকে মাটিতে ফেলিয়াই কাজ করিতে

হয়। বলির পশুর মত পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া মেয়েটা তার প্রতিশোধ নেয়।

হেমাঙ্গিনী বলেন, "আমার অমন মেয়ে হলে গলা টিপে ধরতাম, বাপরে বাপ্ কি গলা !"

অক্ষয়বাবু মাঝে মাঝে ভিতরে ছুটিয়া আসেন, "আমার মাথাটা ঝালাপালা করে দিলেরে বাবা—এই মেয়ে—এ্যাই—চোপ্—চোপ !"

মেয়েটা আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

অসহায় হইয়া পার্ব্বতী মেয়ের পিঠে দুম দুম করিয়া কিল বসাইল, "মর্ হতভাগী মর্!"

হেমাঙ্গিনী তাহাতেও খুশী হন না, "আবার রাগ করে মেয়েকে যে বড় মারা হচ্ছে। ওসব আমার বাড়ীতে চলবে না, বুঝলি? মাটির মত মুখ বুজে কাজ করতে হবে, হ্যা।"

পার্ব্বতী মেয়েকে লইয়া আড়ালে গেল। সেখানে মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আদর করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বড় লেগেছে, না মা? আহা—না, কাঁদে না লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।"—

স্তন্যপান করাইয়া মেয়েকে সে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটার ক্ষুধাও পাইয়াছে, সে কান্না থামায় না।

বড় বৌ লুচি ভাজিতেছিল ছেলেমেয়েদের জন্য। পার্ব্বতী সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

"বৌদি।"

"কি চাস্?"

"আমার এই মেয়েটাকে একটা দাও না গো।"

"কি?"

"একটা লুচি।"

"ও মা! তোর সখ ত কম নয় লা! ওমা শুনছেন?"

"কি বৌমা ?"—হেমাঙ্গিনী আগাইয়া আসিলেন।

"পার্ব্বতী লুচি চাইছে মেয়ের জন্ম।"

"বটে ! তোর মেয়ের নলা ত' কম নয়। অত সখে কাজ নেই, বুঝলি ? কথা বলছিস না যে, বলি শুন্‌লি ?"

"হ্যাঁ মা।"

(পার্ব্বতী তোমার মেয়ের ক্ষুধাটা না থাকিলে ভাল হইত, না ?)

মাস দেড়েক পরে বাড়ীতে একজন অতিথি আসিল। অক্ষয়বাবুর শ্যালক অনুপম। ছাব্বিশ সাতাশ বয়স, অত্যধিক সৌখীন যুবক। পশ্চিমে কোথায় কাজ করিত, সেখান হইতে বদলী হইয়া আসিল।

দুপুর বেলায় সেদিন অনুপমের নজর পড়িল মাণিকের উপর।

"তুই কে রে ?"

"এজ্ঞে আমি পার্ব্বতীর সোয়ামী"।

অনুপম সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিল। মাণিকের চেহারার ইতিমধ্যে একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রামেতে যাত্রার দলে, কবির দলে সে প্রায়ই থাকিত, সখ তাহার কম ছিল না। বড়লোকের বাড়ীতে চারটি খাইতে পাইয়া তাহার চেহারায় একটু সুস্থতার চিহ্ন ফিরিয়া আসিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সখও মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। জজ-বাড়ীতে একটি পুরাতন পায়জামা ও একটি সার্ট পাইয়াছে সে—তাহাই বেশ পরিপাটি করিয়া পরিয়াছে। কর্ত্তাদের কাছ হইতে দু'এক আনা পয়সা চাহিয়া লইয়া সে দশ আনা ছয় আনা করিয়া চুলও ছাঁটিয়াছে। আবার এক পয়সার পানের রসে তাহার ওষ্ঠ রঞ্জিত—এক বিচিত্র চেহারা হইয়াছে তাহার।

"ও—তুই পার্ব্বতীর সোয়ামী, তোরই নাম জন্তু।"

"এজ্ঞে।"

"আচ্ছা, পা টেপ, দেখি।"

"এজ্ঞে!"

"টেপ্ বেটা—টেপ্।"

মাণিকের মুখের উপর একটা কালো ছায়া পড়িল, তবু সে আদেশ পালন করিতে বসিল। উপায় কি!

পার্ব্বতীর চেহারারও রূপান্তর ঘটিয়াছে। স্বামী-কন্যাকে নিজের আহারের অংশ দিয়া যেটুকু সে খায় তাহা বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু তাহাতেই তাহার দেহের শ্রী বদ্‌লাইয়াছে। তাহার রুগ্ন দেহের উপর মাংসের আস্তরণ পড়িয়াছে, সুস্নিগ্ধ শ্যামল সৌন্দর্য্যে তাহার যৌবন-সরসী টলমল করিতেছে। মেয়েটারও গায়ে মাংস দেখা যায়।

হেমাঙ্গিনী অক্ষয়বাবুকে বলেন, "দেখছ গো—আমার বাড়ীতে খেয়ে খেয়ে কেমন মোটা হয়ে উঠ্‌ছে ওরা, এঁ্যা?"

অক্ষয়বাবু মাথা নাড়েন।

পার্ব্বতী নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়। কাজের আর শেষ নাই তাহার। একজন ভাত্রের কাঙালকে বাড়ীতে পাইয়া সবাই তাহাকে প্রাণপণে খাটাইতেছে।

অনুপম আজকাল অন্দরমহলে একটু বেশী ঘোরাফেরা করে।

কি একটা কাজে তখন সে আসিয়াছিল।

হঠাৎ পার্ব্বতী একবার চাহিতেই দেখিতে পাইল যে, অনুপম তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিতেছে।

অনুপম হাসিল। পার্ব্বতী মাথা নীচু করিল।

অনুপমের দৃষ্টিতে কি একটা প্রার্থনা ছিল—পার্ব্বতী শিহরিয়া উঠিল।

মাণিকের লোলুপতা আজকাল বাড়িয়া গিয়াছে। প্রায়ই এটা সেটা ভালমন্দ মুখরোচক জিনিষ সে কোথা হইতে যেন লইয়া আসে

আর খায়। বিড়ির বদলে মাঝে মাঝে তাহাকে সিগারেট টানিতেও দেখা যায়।

পার্ব্বতী একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "এত সব ভালমন্দ কোথায় পাও?"

"কেন—জজ-বাড়ী থেকে—তারা দেয় যে।"

পার্ব্বতী বিশ্বাস করিল না।

সেদিন রাত্রে রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হইল। মাণিকের চাকুরী গিয়াছে। সে চুরি করিয়া রোজ ঐসব খাবার আনিত। আজ রাত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কয়েকদিন কিছু পয়সাও চুরি গিয়াছিল, তাহার জন্যও তাহাকে ধরা হইয়াছে। বাবুরা ও অন্যান্য চাকরেরা চাঁদা করিয়া প্রহার দিয়া তাহাকে তাড়াইয়াছে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুইয়া শুইয়া মাণিক গোঙায়।

পার্ব্বতী কাজ সারিয়া মেয়ে ও খাবার লইয়া ভিতরে আসিয়াই চমকাইয়া উঠিল।

"কি হয়েছে গো?" পার্ব্বতী সব শুনিয়াছিল হেমাঙ্গিনীর মুখে একটু আগেই। জজ-বাড়ী হইতে একজন আসিয়া বলিয়া গিয়াছে।

"শালারা বড় মেইরেছে গো—উঃ, সারা শরীরটা টন্‌টন্ করছে।"

পার্ব্বতী কাঁদিয়া বলিল, "চুরি করেছিলে—ছিঃ।"

মাণিক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, পরে বলিল, "চারডি খেতে দিবি?"

"নাও—খাও।"

"উঠ্‌তে লারছি।"

পার্ব্বতী মেয়েকে শোয়াইয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দেয়।

মনে পড়ে। সুন্দর, ছোট্ট গ্রামটি। শ্যামখোভায় ঝলমল করিতেছে অবারিত মাঠ—শ্বশুর সেখানে লাঙ্গল লইয়া গিয়াছে। শরতের নদীর মন্থর স্রোতে গা এলাইয়া জেলেডিঙ্গিগুলি কোথায় চলিয়াছে—

কলসী কাঁখে পার্ব্বতী চলিয়াছে ছুতোর বৌয়ের সঙ্গে স্নান করিতে। উপরে গোবরে নিকানো উঠোনের মত ঝকঝকে আকাশে শঙ্খচিলের প্রসারিত পক্ষ। আঃ—।

(পার্ব্বতী, অতীতকে কি ভোলা যায় না ?)

অনুপম অফিস যায় নাই। শরীর একটু অসুস্থ বলিয়া ছুটি লইয়াছে। ঘরে বসিয়া সে কি যেন একটা বই পড়িতেছিল।

পার্ব্বতী অক্ষয়বাবুর নাতিকে শোয়াইতে পাশের ঘরে গেল।

অনুপম ডাকিল—"এই পার্ব্বতী—শোন্।"—

"বাবু ?"

"এদিকে আয় না।"

পার্ব্বতী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

অনুপম হাসিল, "অত লজ্জা কেন ? ভেতরে আয় না"—বলিয়াই খপ করিয়া পার্ব্বতীর একটি হাত ধরিয়া টান দিল।

"ছিঃ"—পার্ব্বতী অবরুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইল। বাহিরে গিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল। ভগবান!

মাণিক তখনও ফেরে নাই, কাজের চেষ্টায় কোথায় যেন গিয়াছে। পার্ব্বতী খাবার লইয়া বসিয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পরে মাণিক ফিরিল। চেহারা পাগলের মত।

"আজ খাবে না নাকি ?"—পার্ব্বতী প্রশ্ন করিল।

"খাব কোত্থেকে ? তোর কি, তুইত নেমন্তন্ন খাচ্ছিস—আমি শালা কি আর—"

পার্ব্বতী চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই কথা বলতে পারছ তুমি—আমি মাথা খুঁড়ে মরব তবে"—বলিয়াই সে দুঃখে মেঝেতে মাথা ঠুকিতে লাগিল।

"হা-হা-কি করছিস—তোর পায়ে পড়ছি, আমি ঠাট্টা করছিলামরে"
—সাতঙ্কে মাণিক পার্ব্বতীকে জড়াইয়া ধরিল।

মেয়েটা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল আর্ত্তকণ্ঠে।

অনুপমের গলা শোনা গেল "এই ব্যাটা জন্তু, মেয়ের কান্না থামা।

মাণিকের মেজাজ গরম হইয়া উঠিয়াছে, "বাচ্চা মেয়ে, কান্‌ছে ত' কি করব? মেরে ফেলব নাকি?"

অনুপম ছুটিয়া আসিল, "রাস্কেল, মুখের ওপর কথা বলছিস্।" বলিয়াই ঠাস্ করিয়া মাণিকের গালে এক চড় কষাইয়া দিল।

মাণিকের চোখ দুইটি একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়াই নিভিয়া গেল। সে নিষ্ফল আক্রোশে শুধু কাঁপিতে লাগিল। অনুপম চলিয়া গেল।

পার্ব্বতী মেয়েকে স্তন্যপান করাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করে।

খানিক পরে সে বলিল, "নাও খেয়ে নাও।"

মাণিক নড়িল না।

রাত্রে কাজের এক ফাঁকে পার্ব্বতী মেয়েকে ঘরে ঘুম পাড়াইতেছিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে যেন তাহার দেহের উপর হাত রাখিল।

"কে?" পার্ব্বতী চমকিয়া উঠিল।

"আমি, চুপ্।

অনুপম!

"পালান শিগগীর পালান, নইলে চেঁচাব আমি।"

এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে মাণিককে দেখা গেল।

দুর্ব্বল স্বামীর চক্ষু আহত শ্বাপদের চক্ষুর মত জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সে হিংস্র পশুর মত অনুপমের উপর লাফাইয়া পড়িল।

কিন্তু বেশীক্ষণ যুদ্ধ চলে না। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া মাণিক একপাশে পড়িয়া গোঙাইতে লাগিল। পার্ব্বতীর চীৎকারে বাড়ীর মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। পুরুষেরা আর কেউ ছিল না।

"কি-কি হয়েছে রে অনু ?" —হেমাঙ্গিনী দ্রুতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

পকেট হইতে মণিব্যাগটি তুলিয়া ধরিল অনুপম—"এইটে এই ব্যাটা চুরি করেছিল।"

"মিথ্যাবাদী—তুমি আমার বৌয়ের গায়ে হাত দিয়ে কি বলছিলে —এ্যা ? তুমি না ভদ্দরনোক!" মাণিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল।

"চোপরও—চোপ, ইষ্টুপিড, চোর কোথাকার—আবার ভাইকে আমার দোষ দিচ্ছে। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে—বেরো—চোর ছ্যাঁচোড় আমি রাখব না আমার বাড়ীতে, বেরো—" হেমাঙ্গিনী ফাটিয়া পড়িলেন।

"মা"—পার্ব্বতীর চোখে জলের ধারা। কি যেন সে বলিতে চাহিল।

"না—নিকালো—চুরি করবি আবার আমার ভাইয়ের বদনাম করবি—নিকালো হারামজাদ্রী, গেট্ আউট্।"

পার্ব্বতী একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল। নিষ্করুণ হিংসায় সকলের মুখ কঠিন ও কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে।

মেয়েকে কোলে তুলিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া সে বলিল—"চল —ওঠ।"

তাহারা বাহির হইয়া গেল।

অনুপমের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা।

রাজপথ। পাথরের প্রাণ নাই।

"দয়া করুন বাবু—বাবু গো।"

দয়া কি জিনিষ ? কেহ জানে না।

মেয়েটা কাঁদে।

মাণিক ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "মাই খাওয়া লো শুনছিস ?"

"শুনছি ত কান নেই নাকি আমার—খা রাক্কুসী।"

বুকে দুধ নাই তবু মেয়েটা লেহন করে। পশুশাবকের মত ধারালো, খসখসে ওর জিহ্বা।

পথ। গলি। পথ। ভিক্ষা। শূন্য জঠর। এক ইতিহাস বদলায় না।

চাকুরীর চেষ্টাও মাঝে হয়। কেউ চায় না।

মাঝে মাঝে ডাষ্টবিন দেখা যায়। তাহাতেও কিছু নাই।

ক্ষুধার্ত্তের মিছিল। রাজপথে সারি বাঁধিয়া প্রেতেরা গান গায়—অন্নং দেহি।

আর পারি না"—পার্কের ধারে বসিয়া পড়িয়া মাণিক জোরে জোরে শ্বাস টানে।

"বাবুমশায়—দয়া করুন গো—এক মুঠা খেতে দিন গো।"

নাই, নাই। দেশে অন্ন নাই।

মাঝে মাঝে দুই একজন একটু দাঁড়াইয়া, চোখের জ্যোতিকে প্রখর করিয়া পার্ব্বতীর সারাদেহ লেহন করে।

দিন কাটে। দিনের পর দিন কাটে।

মাণিক মরিতে চলিয়াছে। ওর আর ক্ষমতা নাই।

"চারডি ভাত খাওয়াবি পার্ব্বতী, ও পার্ব্বতী।"

পার্ব্বতী কটমট করিয়া তাহার দিকে তাকাইল, ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল পরে বলিল, "হ্যাঁ খাওয়াব।"

"খাওয়া, আমি যে মরে যাচ্ছি পার্ব্বতী—ও পার্ব্বতী"—মাণিক হাঁপায়।

"চুপ করে থাক কতক্ষণ, মেয়েটাকে দেখো, আমি খাবার নিয়ে আসছি, কেমন?"

"আচ্ছা"—

প্রেতের মত লিকলিকে হাত দুইটি বাড়াইয়া অতি কষ্টে মেয়েটাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ঝিমায়। অবসন্ন মৃত্যুর সুবিপুল অন্ধকারের

ছায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি নিঃশ্বাসে তাহার সারা দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

মেয়েটা কাঁদে। মা ছাড়া সে থাকিতে চায় না।

পার্ব্বতী সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

অনুপম চমকিয়া উঠিল।

জানালার ধারে কে যেন ডাকিতেছে—"বাবু—বাবু।"

"কে?"

"আমি পার্ব্বতী।"

"পার্ব্বতী! কি চাস্?"—অনুপম হাসিল।

দরজা খোল, যা চাও তাই তুমি পাবে।"—দাঁতে দাঁত চাপিয়া পার্ব্বতী বলল।

এদিক ওদিক চাহিয়া অনুপম বারান্দার দিকের দরজা খুলিল। পার্ব্বতী ঘরে ঢুকিল। তাহার হাত ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে অনুপম বলিল, বড় রোগা হয়ে গেছিস্ তো!"

পার্ব্বতী ম্লান হাসিল, "কেন পছন্দ হচ্ছে না?"

"না—না, তা নয় বা:"—অনুপমের ললাটে স্বেদবিন্দু চক্‌চক্ করে।

অন্ধকার।

টলিতে টলিতে পার্ব্বতী ফিরিয়া আসিল। আঁচলে কাগজের ঠোঙ্গায় কিছু ভাত ও তরকারী।

"ওগো"—মাণিককে সে ঠেলা দিল।

মাণিক জবাব দেয় না।

"ওগো—এই—ও টুনুর বাপ।"

মণিক মরিয়াছে।

পার্ব্বতীর হাত হইতে ভাতের ঠোঙ্গা পড়িয়া গেল।

সে চারিদিকে চাহিল। মেয়েটা কই?

টুনু—টুনু—ও মা।"

কোনও জবাব নাই।

পাগলের মত পার্ব্বতী পার্কের ভিতরে খুঁজিয়া আসিল, পথেতে খুঁজিল। কোথাও নেই।

"হ্যাঁ গা, একটা ছোট মেয়েকে দেখেছ ইদিকে, ছোট মেয়ে লাল পিরান গাঁয়ে—এ্যাঁ?" সে প্রশ্ন করে সবাইকে।

না। কেউ জানে না মেয়েটা কোথায়। শেষ সম্বলটাও গেল। যাক্। শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে টলিতে টলিতে ক্লান্তপদে পার্ব্বতী আবার স্বামীর পাশে ফিরিয়া আসিল। তাহার বুকের কাপড় সরিয়া গিয়াছে, মাথার রুক্ষ খোলা চুল বিপর্য্যস্ত হইয়া পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চোখে জ্বালাময়ী দৃষ্টি। ভৈরবীর মত।

মৃত স্বামীর মুখের দিকে সে চাহিল। মাণিকের মুখে মাছি বসিয়াছে। ভাতের ঠোঙ্গায় ভাত নাই, কেহ লইয়া গিয়াছে।

পার্ব্বতী কাঁদে না, একটুও না।

গ্যাসের সেড দেওয়া আলোতে সে হাত মেলিয়া ধরিল। একটা এক টাকার নোট ও খুচরা কয়েক আনা পয়সা। পয়সাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। অনুপম কথা দিয়াছে—তাহার আবার বহাল হইবে।

সেই পয়সার দিকে চাহিয়া হঠাৎ পার্ব্বতীর ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল—কিছু বলিতে চাহিল বোধ হয়। সে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিল।

পার্ব্বতী হাতের দিকে চাহিয়া ভাবে—অতীতের কথা নয়, ভবিষ্যতের। নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে সে যেন একটা বাঁকা তলোয়ার ধরিয়া আছে। দুই চক্ষু তাহার নির্ব্বাণোন্মুখ চিতাগ্নির মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতে থাকে।

(পার্ব্বতী ভয় নাই। সৈনিকেরা প্রস্তুত আছে)।